মে ২০২১ ■ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মহান মে দিবস: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী

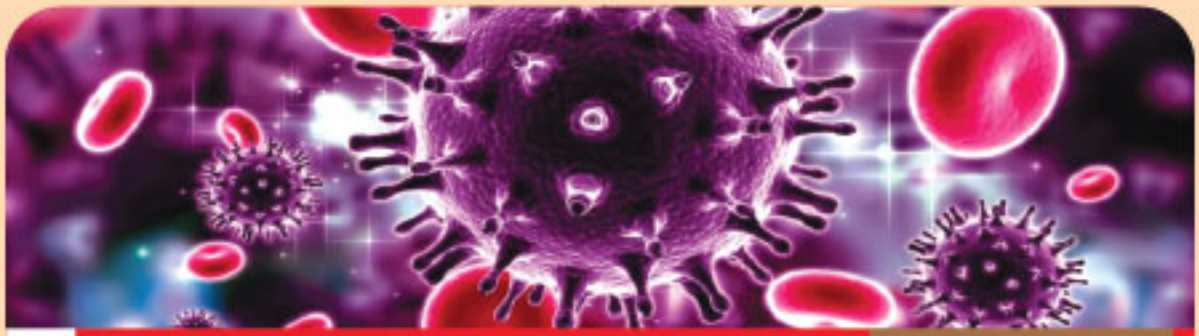

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মে ২০২১ ❑ বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে এপ্রিল ২০২১ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন হলে অনুষ্ঠিত হাইলেভেল ইন্টারেকটিভ ডায়ালগ অন এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর)-এর ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

পহেলা মে মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা উপযুক্ত মূল্য এবং দৈনিক অনধিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির অধিকার। মে দিবসের পথ ধরেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের অধিকার, মজুরি, কাজের পরিবেশ, সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বাংলাদেশে এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়– 'মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষ, মুজিববর্ষে গড়বো দেশ'। মে দিবস নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শহিদ হওয়ার সময় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। বিদেশে থাকায় রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা। ছয় বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন শেখ হাসিনা। ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, কবিতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর বিচরণ সর্বত্র। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে তিনিই প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর স্মরণে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর কবিতায় মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের কথা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর স্মরণে এ সংখ্যায় নিবন্ধ রয়েছে, রয়েছে কবিতা।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী মা দিবস হিসেবে পালিত হয়। মা দিবস নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ। ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ৩১শে মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে উপলক্ষ করে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ রয়েছে এ সংখ্যায়।

আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

ভাষণ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা ৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

ঈদের আনন্দ ঈদের আহকাম ৯
মনিরুল ইসলাম রফিক

মহান মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক ১০
ড. মোহাম্মদ আলী খান

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীসমাজ ১২
ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রভাব ১৪
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

দুঃসহ স্মৃতি : ১৯৭১ গণহত্যা-ডেমরা ১৮
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

অভাজনের কবি কাজী নজরুল ২১
অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী

মা কথাটি ছোট্ট অতি, কিন্তু... ২৩
নাসরীন মুস্তাফা

নজরুল কাব্যে ঈদুল ফিতর ২৫
জাফরুল আহসান

কবি নজরুলের মানিকগঞ্জ সফর: একটি অনুসন্ধান ২৭
শ্যামল কুমার সরকার

জগৎমল্লপাড়া গণহত্যা ৩১
কাজী সালমা সুলতানা

চলচ্চিত্রে তামাক সেবনের দৃশ্য ধূমপানে তরুণদের উৎসাহী করে ৩২
সৈয়দা অনন্যা রহমান

পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল বাংলাদেশ ৩৫
সুস্মিতা চৌধুরী

নিরাপদ মাতৃত্ব এবং করোনা ঝুঁকি ৩৬
সামিরা আলম

গল্প

একজন অনাগরিকের গল্প ৩৭
সাইফুল ইসলাম জুয়েল

হাইলাইটস

কবিতাগুচ্ছ ৪১-৪৫

আসলাম সানী, সৌম্য সালেক, আরজুমান আরা, সোহরাব পাশা, আতিক আজিজ, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, গোলাম নবী পান্না, ওয়াসীম হক, আহসানুল হক, আব্দুল আউয়াল রণী, আবুল হোসেন আজাদ, নাসিমা আক্তার নিঝুম, বশিরুজ্জামান বশির, এইচ এস সরোয়ারদী, এম ইব্রাহীম মিজি, অর্ণব আশিক, কবির কাঞ্চন, বোরহান মাসুদ, জব্বার আল নাঈম, রূপশ্রী চক্রবর্ত্তী, খোরশেদ আলম নয়ন, সাবিত্রী রানী, জান্নাতুল ফেরদৌস স্মৃতি

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
শিক্ষা ৫৩
বিনিয়োগ ৫৩
নারী ৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫
কৃষি ৫৫
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
বিদ্যুৎ ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
যোগাযোগ ৫৯
কর্মসংস্থান ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে কিংবদন্তি অভিনেত্রী কবরী ৬৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই এপ্রিল ২০২১ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ নতুন করে আঘাত হানায় পয়লা বৈশাখের আনন্দ গত বছরের মতো এবারও ঘরে বসেই উপভোগ করার আহ্বান জানিয়ে ১৪২৮ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

বাংলাদেশে পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর বিদেশে ছয় বছর নির্বাসনে কাটিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি নানা কারণে তাৎপর্যবহ। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস নিয়ে 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস: নবজাগরণের সূচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৭

রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বাঙালি হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ এবং গভীর প্রভাব। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে 'বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রভাব' শীর্ষক নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-১৪

নজরুল জয়ন্তী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। বিদ্রোহী কবি শোষক, শাসক, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, শঠতা, প্রতারণাসহ সকল অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে রণতূর্য বাজিয়েছেন। নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে 'অভাজনের কবি কাজী নজরুল', 'নজরুল কাব্যে ঈদুল ফিতর' এবং 'কবি নজরুলের মানিকগঞ্জ সফর: একটি অনুসন্ধান' শীর্ষক নিবন্ধসমূহ দেখুন, পৃষ্ঠা-২১, ২৫ ও ২৭

মহান মে দিবস: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

পহেলা মে মহান মে দিবস। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অধিকার ও স্বীকৃতি আদায়ের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার মে দিবসকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। সেই থেকে ঐতিহাসিক মে দিবস বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটি মহান দিন। এ নিয়ে 'মহান মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী: বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীসমাজ' শীর্ষক নিবন্ধগুলো দেখুন, পৃষ্ঠা-১০ ও ১২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই এপ্রিল ২০২১ বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[১৩ই এপ্রিল ২০২১]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

দেশ-বিদেশে যে যেখানেই আছেন– সবাইকে জানাই ১৪২৮ বঙ্গাব্দের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ।

আজ আবাহনের দিন। 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো/মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা' – কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী এই গান গেয়ে আজ আমরা আবাহন করব নতুন বছরকে। একইসঙ্গে শুরু হয়েছে মুসলমানদের পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস– মাহে রমজান। আমি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

নতুন বছরের শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চারনেতার প্রতি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

আমি স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও দশ বছরের ছোট্ট শেখ রাসেলকে, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

প্রিয় দেশবাসী,

সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে সময় চলে যায়। করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যেই আমরা এক বছরের অধিক সময় পার করলাম। গত বছর মার্চের প্রথম সপ্তাহের দিকে আমাদের দেশে করোনাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। নানা আশঙ্কা আর আতঙ্ক গ্রাস করেছিল আমাদের। সেসব মোকাবিলা করেই আমাদের টিকে থাকতে হয়েছে।

এরই মধ্যে করোনাভাইরাসের থাবায় আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক প্রিয়জনকে, আপনজনকে। আমি সকলের রুহের মাগফেরাত এবং আত্মার শান্তি কামনা করছি। স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। আবহমানকাল ধরে বাংলার গ্রামগঞ্জে, আনাচে-কানাচে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। গ্রামীণ মেলা, হালখাতা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন ছিল বর্ষবরণের মূল অনুষঙ্গ।

ব্যবসায়ীরা আগের বছরের দেনা-পাওনা আদায়ের জন্য আয়োজন করতেন হালখাতা উৎসবের। গ্রামীণ পরিবারগুলো মেলা থেকে সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র কিনে রাখতেন। গৃহস্থ বাড়িতে রান্না হতো সাধ্যমতো উন্নতমানের খাবার।

১৯৬০'র দশকের শেষ ভাগে ঢাকায় নাগরিক পর্যায়ে ছায়ানটের উদ্যোগে সীমিত আকারে বর্ষবরণ শুরু হয়। আমাদের মহান

স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব নাগরিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯৮০'র দশকে পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। মূলত আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনসমূহের কর্মী-সমর্থকদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই আজকের এই অবস্থান। কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ধারকবাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখ আমাদের সকল সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা পরিহার করে উদার-নৈতিক জীবনব্যবস্থা গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের মনের ভেতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে আমাদের নতুন উদ্যমে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা যে বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণে আমাদের মধ্যে এই স্বাজাত্যবোধ এবং বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়।

আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের যে প্রান্তেই বাঙালি জনগোষ্ঠী বসবাস করেন, সেখানেই বাঙালির হাজার বছরের লোক-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছে বর্ষবরণসহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আর পৃথিবীজুড়ে তৈরি হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সেতুবন্ধ।

গত বছরের মতো এ বছরও আমরা বাইরে কোনো অনুষ্ঠান করতে পারছি না। কারণ করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ নতুন করে আঘাত হেনেছে সারা দেশে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের করোনাভাইরাস আরো মরণঘাতী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। পয়লা বৈশাখের আনন্দ তাই গত বছরের মতো এবারও ঘরে বসেই উপভোগ করব আমরা। টেলিভিশন চ্যানেলসহ নানা ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হবে। সেসব অনুষ্ঠান উপভোগ ছাড়াও আমরা নিজেরাও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

অতীতের সকল জঞ্জাল-গ্লানি ধুয়ে-মুছে আমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করব। দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাব সামনের দিকে। গড়ব আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ– এই হোক এবারের নতুন বছরের শপথ। কবিগুরুর ভাষায় আবারও বলতে চাই:

নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত!
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

প্রিয় দেশবাসী,

গত বছর করোনাভাইরাস আঘাত হানার পর আমাদের নানাবিধ বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই মহামারি প্রতিরোধে যেহেতু মানুষের সঙ্গ-নিরোধ অন্যতম উপায়, সেজন্য আমাদের এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে যার ফলে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব পড়েছে।

গত সপ্তাহে দ্বিতীয় ঢেউ প্রবল আকার ধারণ করলে মানুষের চলাচলের উপর আমাদের কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হয়। আপনারা দেখেছেন, কোনোভাবেই সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে তাই আমাদের আরো কিছু কঠোরব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। আমি জানি, এর ফলে অনেকেরই জীবন-জীবিকায় অসুবিধা হবে। কিন্তু আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে– মানুষের জীবন সর্বাগ্রে। বেঁচে থাকলে আবার সব কিছু গুছিয়ে নিতে পারব।

গত বছর আমরা একটানা ৬২ দিন সাধারণ ছুটি বলবৎ করেছিলাম। আমরা এখনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিতে পারিনি। বিদেশের সঙ্গে চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। এই অবস্থা শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের যেখানেই এই মরণঘাতী ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে, সেখানেই এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।

মানুষের জীবন রক্ষার পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতি, মানুষের জীবন-জীবিকা যাতে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে না পড়ে সেদিকে আমরা কঠোর দৃষ্টি রাখছি। সকলের সহযোগিতায় আমরা বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম, যার ফলে গত বছর করোনাভাইরাস মহামারিজনিত প্রভাব আমরা সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।

করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গত বছর আমরা চারটি মূল কার্যক্রম নির্ধারণ করেছিলাম। চারটি কার্যক্রম হচ্ছে:

(১) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা: সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'কর্মসৃজনকেই' প্রাধান্য দেওয়া;

(২) আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ন: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা;

(৩) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি: দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ, দিনমজুর এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি;

(৪) মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা: অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সরবরাহ এমনভাবে বৃদ্ধি করা যেন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে।

এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। কলকারখানায় যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা দিনমজুর, পরিবহণ শ্রমিক, হকার, রিকশাওয়ালা, দোকান কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন, অন্যান্য

ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবাদানকারী, সাংবাদিকসহ নিম্নআয়ের নানা পেশার মানুষকে সহায়তা দিয়েছি। প্রায় আড়াই কোটি মানুষকে বিভিন্ন সরকারি সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে।

আপনাদের শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সরকার সব সময় আপনাদের পাশে রয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানার পর আমি দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষদের সহায়তার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে পল্লি অঞ্চলে কর্মসৃজনের জন্য ৮০৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা এবং পবিত্র রমজান ও আসছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৬৭২ কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। এর দ্বারা দেশের প্রায় ১ কোটি ২৪ লাখ ৪২ হাজার নিম্নবিত্ত পরিবার উপকৃত হবেন। গত বছর করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকে ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফসহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের সৌভাগ্য টিকা উৎপাদনের শুরুতেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টিকার ডোজ আমরা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। ইতোমধ্যেই ৫৬ লাখের বেশি মানুষকে প্রথম ডোজ টিকা দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। যারা প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছেন তাদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে। আমরা পর্যায়ক্রমে দেশের সকলকে টিকার আওতায় নিয়ে আসব। আমাদের সে প্রস্তুতি রয়েছে।

তবে টিকা দিলেই একজন সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হবেন এমন নিশ্চয়তা নেই বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। কাজেই টিকা নেওয়ার পরও আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ঢাকাসহ সারা দেশের প্রতিটি জেলায় করোনাভাইরাস রোগীর চিকিৎসা সুবিধার আওতা আরো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে করোনাভাইরাস রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান আইসিইউ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

তবে আমাদের সবাইকে সাবধান হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আমাদের নিজের, পরিবারের সদস্যদের এবং প্রতিবেশীর সুরক্ষা প্রদানের। কাজেই ভিড় এড়িয়ে চলুন। বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন। ঘরে ফিরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গরম পানির ভাপ নিন। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যে ১৮ দফা নির্দেশনা জারি করেছে। আমরা যদি সকলে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, অবশ্যই এই মহামারিকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবো, ইনশাল্লাহ।

প্রিয় দেশবাসী,

যুগে যুগে মহামারি আসে, আসে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ-দুর্বিপাক। এসব মোকাবিলা করেই মানবজাতিকে টিকে থাকতে হয়। জীবনের চলার পথ মসৃণ নয়। তবে পথ যত কঠিনই হোক, আমাদের তা জয় করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় তাই বলতে চাই:

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজীব জগৎ বিচিত্রতর বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান।

বাঙালি বীরের জাতি। নানা প্রতিকূলতা জয় করেই আমরা টিকে আছি। করোনাভাইরাসের এই মহামারিও আমরা ইনশাল্লাহ মোকাবিলা করব। নতুন বছরে মহান আল্লাহর দরবারে তাই প্রার্থনা– বিশ্বকে এই মহামারির হাত থেকে রক্ষা করুন।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। সবাইকে আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবস উপলক্ষে ১৮ই এপ্রিল ২০২১ ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ জাতীয় পতাকা নিয়ে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করেন– পিআইডি

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে ১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল দুপুর ১২টা ৪১ মিনিটে। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় বর্তমান মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেওয়ার পরদিনই কলকাতায় পাকিস্তানের মিশন 'বাংলাদেশ মিশন' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সেই দিনটিকে স্মরণ করে ১৮ই এপ্রিল ২০২১ কলকাতায় উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে কলকাতা উপ-হাইকমিশন ভবনের চারদিকে প্রদক্ষিণ করেন। পতাকার চার প্রান্তে চার উইং প্রধান কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম, কাউন্সেলর (কনস্যুলার) মো. বশির উদ্দিন, প্রথম সচিব (প্রেস) ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল, প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মো. শামছুল আরিফ ও মাঝে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান এবং মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান বি এম জামাল হোসেন পতাকা ধরে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণ ঘুরেন। পরে পতাকা উত্তোলনের নিয়ম যথাযথভাবে মেনে জাতীয় সংগীতের সাথে উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান।

পতাকা উত্তোলনের ব্যাপারে তৌফিক হাসান বলেন, আজকের দিনটি বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস ডে হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনায় দেশের মানুষ এক হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে স্বাধীন করে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান করে নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রতিবেদন: ইশরাত হক

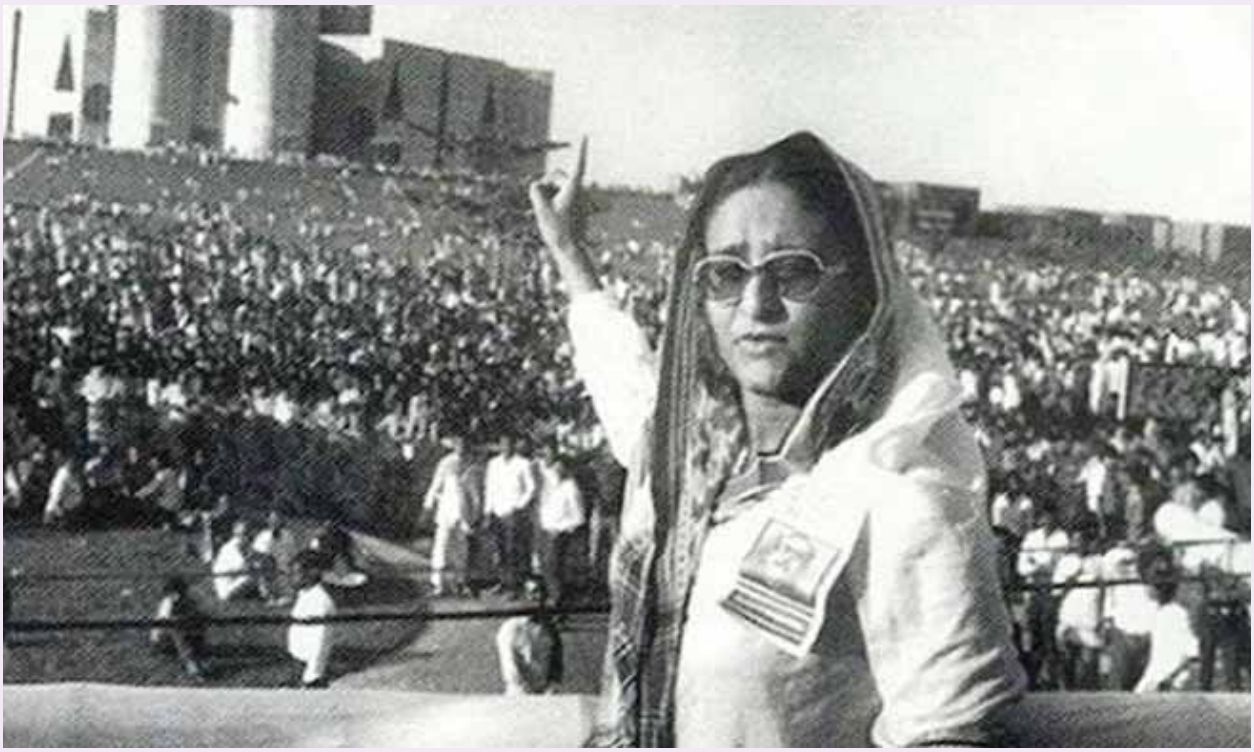

প্রায় ছয় বছর নির্বাসিত থেকে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফেরেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার বৈভবপূর্ণ দিনপঞ্জির রেড মার্কেবল একটি দিবস। পঁচাত্তরের পরে বিদেশে প্রায় ছয়টি বছর নির্বাসনে কাটিয়ে এদিন তিনি মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। দিবসটি তাই আমাদের কাছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে চিহ্নিত। অনুরূপভাবে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি জিন্দানখানা থেকে বঙ্গবন্ধুর সদ্য স্বাধীন বাংলায় ফিরে আসার দিনটিও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে আমরা পালন করি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার এবারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি নানা কারণে তাৎপর্যবহ। ইতোমধ্যে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পালন করেছি বৈশ্বিক করোনা মহামারি পরিবেশে। পাশাপাশি মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার সুপারিশ দেশবাসীকে আনন্দে মুখরিত করেছে। করোনা সংকটেও আমাদের জীবনযাত্রা অচল হয়নি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায়।

ধর্মান্ধদের অরাজক অবস্থার সৃষ্টি ও করোনা কোভিডের চেয়েও একাশির সতেরোই মে ছিল আরো ভয়ংকর। দেশ তখন সামরিক শাসক জিয়া হাফ পাকিস্তানে পরিণত করেছিল। সংবিধানের একাত্তরের চেতনা বিলুপ্তসহ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানে জুড়ে দিয়েছিল। জামাতিদের বিশেষ করে একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধীদের দেশে ডেকে এনে দালাল আইন বাতিল করে, তাদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছিল। আর তার মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বসিয়েছিল স্বাধীনতার শত্রুদের। প্রশাসনের মূল দায়িত্ব দিয়েছিল পাকিস্তান প্রত্যাগত স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রু সচিব শফিউল আজমকে।

শুধু তাই নয়, ক্ষমতা দখল করে এই জিয়াই বঙ্গবন্ধুকে অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করে, তাঁর সহকর্মীদের হত্যা থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও নির্যাতন চালায়। সেনানিবাসে থেকে হ্যাঁ-না ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। স্বাধীনতা স্বপক্ষের লোকগুলো আড়ালে আবডালে থেকে প্রাণ বাঁচায়। কেউবা প্রাণ বাঁচায় দেশের বাইরে পালিয়ে। এমন এক পরিবেশে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে শেখ হাসিনা দেশের মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য স্বদেশে ফিরে আসেন একাশির সতেরোই মে।

আমরা সকলেই জানি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের শোকাবহ ঘটনা। সেদিন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে ব্রাসেলসে থাকায় খুনিদের হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পান। সেদিন তাঁরা আমাদের রাষ্ট্রদূত প্রখ্যাত কবি সানাউল হকের বাসায় ছিলেন। ঐ তথাকথিত কবি ঢাকার খবর শুনে দুই বোনকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেন। পরে তাঁরা প্রাক্তন স্পিকার হুমায়ূন রশিদের বাসায় আশ্রয় নেন। একপর্যায়ে তাঁরা আশ্রয় নেন ভারতে, একাত্তরের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীর বদান্যতায় লন্ডন ও ভারতে তাঁদের যাপিত জীবন ছিল ভয়-ভীতি ও সংকটে জর্জরিত। দেশের অবস্থাও তখন প্রতিকূলে। বঙ্গবন্ধুর সেকেন্ড রেভ্যুলেশনের অবকাঠামো খুনি জিয়া ভেঙে দলটিকে খণ্ড-বিখণ্ডও করেছিল। এমনই এক পরিবেশে দলের মূলশক্তির পরামর্শে শেখ হাসিনা

বুকে শোকের পাথর বেঁধে দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। আসার দিনটিও ছিল প্রতিকূল পরিবেশের। আকাশের কালো মেঘের বর্ষণ ও ঝড়ো হাওয়া আমাদের সেদিন পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। আগে ঠিক করা হয়েছিল ঢাকার সবচেয়ে বড়ো এভিনিউ অর্থাৎ জাতীয় সংসদের দক্ষিণের মানিকমিয়া এভিনিউতে গণসংবর্ধনা দেওয়া হবে। সেদিন ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেও সরকারি বাধা ডিঙিয়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে জয়দেবপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ শহরতলির লক্ষ লক্ষ মানুষ তেজগাঁও থেকে ফার্মগেট এবং ফার্মগেট, আসাদ গেট ও বত্রিশ নম্বর সড়কে অবস্থান নেন। আর মানিকমিয়া এভিনিউতো তখন জনসমুদ্র। তাদের বুকে শোকের বেদনা ও জল একাকার হয়েছিল বৃষ্টির কান্নায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে ভিজে সেদিন মঞ্চে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন শেখ হাসিনা। এক পর্যায়ে অশ্রুসিক্ত বদনে তিনি বলেন, 'আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই এবং হারাবারও কিছুই নেই। আমি মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি মানুষের কল্যাণ চাই। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই'।

এরপর তিনি পিতৃগৃহে রওনা করলে পুলিশ বাধা দেয়। প্রায় এক বছর পর সাত্তারের শাসনামলে তিনি বত্রিশ নম্বর সড়কে মাতা-পিতার ঘরে প্রবেশ করেন। যেখানে মেশানো ছিল রক্ত ও স্মৃতির বেদনা। বুকফাটা ক্রন্দনে উচ্চৈঃস্বর আর আর্তি।

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেই ভোট ও ভাতের অধিকার উদ্ধারের লড়াইয়ে নিযুক্ত হন। তাঁকে ষোলোটি বছর সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে। বার বার তাঁকে মেরে ফেলার জন্য আক্রমণ করা হয়েছে। দলীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ কর্মীদের অকাতরে মেরে ফেলা হয়েছে। আওয়ামী লীগ তথা স্বাধীনতার স্বপক্ষের বিপক্ষ শক্তি হলো একাত্তরের পরাজিত পাকিস্তানি দালালগোষ্ঠী এবং বাইরের ইন্ধনদাতারা। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেও তাদের শিক্ষা হয়নি। আজো তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে হামলা চালায়। দেশের শান্তি বিনষ্ট করতে চায়।

শেখ হাসিনা আমাদের দুর্দিনের কাণ্ডারি এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল কন্যা। ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন তিনি ক্ষমতায় আসীন হন। প্রায় একুশ বছর পর। রাজনীতির ডালপালা ও শেকড় ছিল তাঁর অবয়বে। একুশ বছরের জঞ্জাল তাই সরাতে প্রথমেই পঞ্চম সংশোধনী সংশোধন এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার, একাত্তরের খুনিদের বিচার, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, একাত্তরের মিত্রশক্তির মিত্রদের সম্মান, মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ অর্থ প্রদান এবং জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে যাবতীয় কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন।

বিশ্বের একটি আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মধ্যবিত্ত থেকে উন্নয়নশীল ধাপে ওঠায় গোটা পৃথিবীতে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নেত্রী শেখ হাসিনার কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা জোর গলায় বলতে পারি– সীমান্ত সমস্যা নিষ্পত্তি, সমুদ্র বিজয়, মাতৃভাষার স্বীকৃতি, স্বাধীনতা স্মারক স্থাপন, পদ্মা সেতু নির্মাণ, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, মহাশূন্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রেরণ, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ জাতিসংঘের স্মারকে নিবন্ধন, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দেশের সকল অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মৌলিক চাহিদা পূরণে তাঁর নির্দেশনা প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা এনেছে। সোজা কথায় বলা যায়, তিনি সতেরোই মে দেশে ফিরে না আসলে আমরা এতদিনে পাকিস্তান কনফেডারেশনে পরিণত হতাম। বঙ্গভঙ্গকারীদের উত্তরসূরিরা দেশটিকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলত। যা আমরা দেখেছি ১৯৯৬ সালের পূর্বে ও ২০০২ সালের পরের বছরগুলোয়। এরা ধর্মের ধুয়া তুলে সরলপ্রাণ মানুষগুলোকে বিপথে পরিচালিত করে। ষড়যন্ত্র করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষজনকে হত্যা করতে পিছপা হয় না। আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ১ মাসের মধ্যেই তারা পিলখানায় বিপথগামী বিডিআর সদস্যদের দিয়ে সেনা হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ঠিক তেমনি জিয়াও ক্ষমতায় আসীন হয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন সেনানিবাসে সৈনিকদের অকাতরে হত্যা করেছিল। এদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু করেছিল ফারুক-রশীদ-মোশতাক-জিয়া এবং হক, তোহা, মতীন ও সিরাজ শিকদাররা। আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড চার্জের কথা আমরা সবাই জানি। ঐদিন আইভী রহমানসহ ২৫ জন নিরীহ মানুষ মারা যান। আহত হন শত শত।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আমাদের দুর্দিন ও দুঃসময়ের দিশারী। তাঁর দূরদর্শী, সাহসী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে শত বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। জাতীয় জীবনে নবজাগরণের যে সূচনা হয়েছে, তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে জাতিবিরোধী দেশি-বিদেশি কায়েমি স্বার্থবাদী চক্র।

বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন দৃশ্যমান। দৃশ্যমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ড ও সরকারি পদক্ষেপ। আমাদের যা কিছু অর্জন ঐ একুশ বছর বাদে, তার মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ এবং গণতন্ত্রের মানসকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। জয় বাংলা।

লেখক: সাহিত্যিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

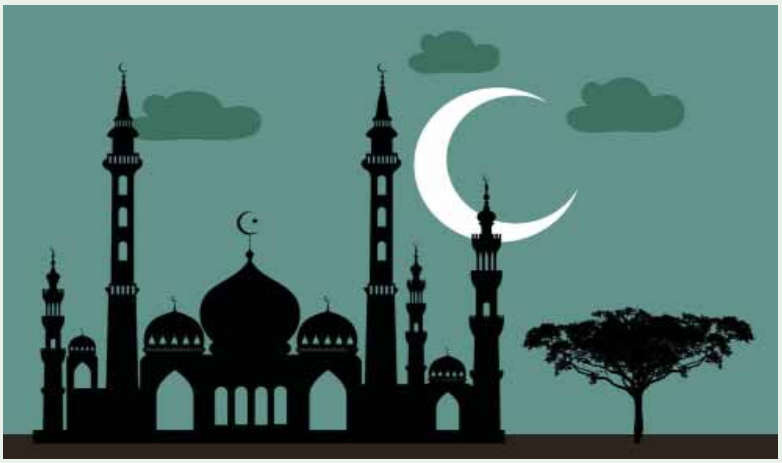

ঈদের আনন্দ ঈদের আহকাম

মনিরুল ইসলাম রফিক

তিরিশ রোজার সিয়াম শেষে/ এল খুশির ঈদ, জাগলো আকাশ পাহাড় নদী/ ভেঙে চাঁদের নিদ। –(কবি ফজলে খোদা)

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার ধারাবাহিকতায় বিদায় নিল রহমতের দশক, মাগফেরাতের মাঝের দশ দিন ও ইতিকাফের স্বর্গীয় আমেজ, শবেকদর। এখন সামনে শুধু ঈদের ইবাদত, ঈদের আনন্দ। মুসলিম জিন্দেগিতে এ এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির দ্রুত পরিসমাপ্তি। মাহে রমজানের পর শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ উদয় হওয়ার পয়গাম মুসলিম সমাজে কী যে বাঁধভাঙা আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে তা একমাত্র কোনো যশস্বী কবির মুখেই শোভা পায়। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো, কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো, বরষের পরে আসিলে ঈদ!'

আসলে এ ঈদ আনন্দের কোনো তুলনা হয় না। আর আরবি 'ঈদ' শব্দের অর্থও খুশি, আনন্দ। আবার ঈদের আরেক অর্থ বার বার আসা। ফিতর মানে ভাঙা। বছর ঘুরে সিয়ামের মাসের পর রোজা ভাঙার এ উৎসব বার বার ফিরে আসে বলেই এই ঈদ, ঈদুল ফিতর নামে পরিচিত। অর্থাৎ মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফিতর হলো রোজা ভাঙার উৎসব। তাহলে নামেই বুঝা যায়, এদিন কোনো সচরাচর আনন্দোৎসবের দিবস নয়, এ হলো রোজাদারের সাধনার সুফলের বহিঃপ্রকাশ। খুশি ও ইবাদতের সমন্বিত এক নির্মল আনন্দধারা।

মাহে রমজান মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে নিয়ে এসেছিল খোদাভীতি, সংযম, সাম্য, মৈত্রী ও ভালোবাসার সওগাত। মাসব্যাপী এসব সাধনা ও অনুশীলনে প্রতিটি মুসলমান কাঙ্ক্ষিত নৈতিক চরিত্রগুলো অর্জন করেছেন বৈ-কি। ঈদের আনন্দধারায় তা সমাজে প্রদর্শনের বাস্তব মহড়া শুরু হবে, যা গোটা বছরের জন্য উম্মাহর পাথেয় হয়ে থাকবে ইসলামের দর্শন। তাই এই ঈদের আনন্দ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জিত আনন্দ উৎসব কিংবা উৎসবের নামে হৈ-হুল্লোড় ও বাড়াবাড়িকে সমর্থন করে না।

বস্তুত এ ঈদ ত্যাগের, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আর উৎসর্গ করার, এ ঈদ ধনী-গরিব, শহুরে-গ্রামীণ সবার মাঝে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ রচনার। ঈদের দিনেও ইসলাম তাই গরিবদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারটি প্রাধান্য দিয়েছে। হাদিস শরিফে ঈদের নামাজের আগেই গরিবদের হক মিটিয়ে দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের হাত পাততে না হয়।

নজরুল ধনীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত/ কোরো না হিসাবি, আজি হিসাবের অঙ্কপাত! একদিন করো ভুল হিসাব।'

একইভাবে সত্যিকারের ঈদের আনন্দ রোজাদারের আমল বৃদ্ধি করে, নাজাতের পথকে করে সুগম। ঈদের (পূর্ব) রাতকে ইসলাম ঘোষণা করেছে পুরস্কার বিতরণের রজনি হিসেবে। আমাদের নবিজি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি আত্মসমালোচনার সঙ্গে দুই ঈদ পূর্ব রাতে জেগে জেগে ইবাদত করে সেদিন তার অন্তর মরবে না যেদিন সকলের অন্তর মরে যাবে।' আল্লাহর রাসূলের (সা.)-এ মূল্যবান হাদিসের ওপর আমাদের আমল করা উচিত। ঈদুল ফিতর প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এক দীর্ঘ বয়ানে বর্ণনা করেন, যখন ঈদের সকাল হয় তখন মহান আল্লাহ প্রতিটি দেশে দেশে ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। তারা অবতরণ করে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ডাকতে থাকেন। তাদের আহ্বান মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত আল্লাহর সব মাখলুকই শুনতে পায়। তারা বলেন, ওহে উম্মতে মুহাম্মদী! বের হয়ে এসো অতি মর্যাদাবান প্রতিপালকের নিকট। তিনি অধিক পরিমাণে দান করে থাকেন। আর মারাত্মক অপরাধও ক্ষমা করেন।

আজকের লাগামহীন ঈদের আনন্দে আমাদের অনেকে ঈদের উপরোক্ত ধর্মীয় গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বেমালুম ভুলে থাকি। যার কারণে আমরা লক্ষ করছি, মুসলমানদের ঈদ ক্রমশ হয়ে পড়েছে নিষ্প্রাণ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন। বস্তুত রমজান সাধনার মাস। এতে সিয়াম, কিয়ামসহ কঠিন ইবাদতসমূহের মাঝামাঝি যেমনি রয়েছে ইফতার-সেহরির আনন্দদায়ক মুহূর্ত। তেমনি ঈদ আনন্দও কিছু বিধিনিষেধে পরিপূর্ণ যা অনিয়মতান্ত্রিকতাকে নিরুৎসাহিত করে এক সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন: ঈদের নামাজের প্রাক্কালে কিছু মুস্তাহাব কাজ করার বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে– ১. ঈদগাহে গমনের পূর্বে ফজরের পর কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার গ্রহণ ২. গোসল করা ৩. মিসওয়াক করা ৪. খুশবু ব্যবহার করা ৫. উত্তম কাপড়চোপড় পরিধান করা ৬. ঈদের নামাজে গমনের পূর্বে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ৭. প্রত্যুষে বিছানা ত্যাগ করা ৮. সকাল সকাল ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া ৯. হেঁটে হেঁটে ঈদগাহ অভিমুখে গমন করা ১০. চলতি পথে নিচু কণ্ঠে তাকবীর বলে যাওয়া (তাকবীর– 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ্)। ১১. এক পথে যাওয়া, ভিন্ন পথে আসা ১২. সাজগোজ করা ১৩. উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা ময়দানে ঈদের নামাজ আদায় করা।

আমরা যেন সিয়াম সাধনার শেষ পর্যায়ে ইহতিসাব বা আত্মসমালোচনার মনোভাবে সমৃদ্ধ হয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরকে স্বাগত জানাই, আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: অধ্যাপক, টিভি উপস্থাপক ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত খতিব

মহান মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক

ড. মোহাম্মদ আলী খান

১৮৮৬ থেকে ২০২১। সময় তার আপন নিয়মে এগিয়ে চলেছে। কেটে গেছে ১৩৫ বছর। তথাপি রক্ত, ঘাম আর অশ্রুতে মাখা মহান মে দিবস আজো সারা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের মনে জাগায় উদ্দীপনা। ১৮৮৬ সালে 'হে মার্কেট স্কোয়ারে' যে রক্তগোলাপ প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

বাংলাদেশের সংগ্রামী শ্রমিকেরা, ঐতিহাসিক মে দিবসের সেই আবেদনে সমভাবে সাড়া দেয় সারা বিশ্বের মেহনতি জনতার সঙ্গে। ভারতবর্ষে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল মাদ্রাজে ১৯২৩ সালে। কলকাতায় তথা অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৭ সালে। দেশ বিভাগের পূর্বে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালিত হয় ১৯৩৮ সালে। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পরও মে দিবসের জমায়েত সহজ ছিল না। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর প্রথমবারের মতো এদেশের শ্রমিক শ্রেণি সর্বপ্রথম বিপুল উৎসাহে মে দিবস পালন করে। আদমজিতে ৩০,০০০ শ্রমিক লাল পতাকা নিয়ে সভা ও মিছিলে অংশ নেয়। ১৯৫৮ সালে আবার সব থমকে যায়, মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা (১৯৭১) পর্যন্ত। তার আগ পর্যন্ত মে দিবসকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার মে দিবসকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন (১লা মে ১৯৭২) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেই থেকে ঐতিহাসিক মে দিবস বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটি মহান দিন, একটি জনপ্রিয় দিন। সময় গড়িয়ে চলে, শ্রমিকদের কাফেলা কখনো থেমে থাকেনি। এর ভেতর স্বাধীনতার পরও সামরিক আইনের যাতাকলেও পিষ্ট হতে হয় শ্রমিকদের। আবার শ্রমিকবান্ধব সরকারও এসেছে। একইসঙ্গে চলেছে শ্রমিকদের পথ চলা। সরকারি পর্যায়ে প্রথম উদ্যোগ দেখা যায় স্বাধীনতার পর পরই। শ্রমনীতি ঘোষিত হয় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে। ঘোষণা করেন তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমেদ চৌধুরী। কিন্তু নানা সমালোচনার কারণে তা আর কার্যকর হয়নি। পরবর্তী সময়ে জারি হয় ১৯৮০ সালের শ্রমনীতি। বর্তমানে প্রচলিত আছে বাংলাদেশ শ্রমনীতি ২০১২। মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনা, আন্তর্জাতিক শ্রম, অন্যান্য সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয় এই শ্রমনীতিতে। এ শ্রমনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গীকার উচ্চারিত রয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমকল্যাণ, শিল্প সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভুবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' প্রণয়ন। স্বাধীনতার আগে অনেকগুলো শ্রম আইন ছিল, সে সকল পুরনো ও শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী ২৫টি আইন বাতিল করে সমন্বিতভাবে একটি মাত্র আইনে নিয়ে আসা হয়। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলাদেশে এ ধরনের উদাহরণ আর নেই। ২০০৮ সালে একবার সংশোধন করে অধ্যাদেশ

জারি করা হয় (বাংলাদেশ শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশ ২০০৮)। তবে ২০১৩ সালে ব্যাপক সংশোধন করা হয় যা বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ নামে অভিহিত। প্রায় ৮৩টি ধারায় এই সংশোধনী আনা হয়। কিন্তু বিতর্ক-সমালোচনা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ২০১৮ সালের ৫৮নং আইন দ্বারা জারি করা হয় বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধনী) আইন ২০১৮।

শ্রমক্ষেত্রের একটি দিক বিশেষত্বের দাবি রাখে। এখানে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রয়েছে শ্রমিক, মালিক ও সরকার। সে সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের উপস্থিতি সর্বজনগ্রাহ্য, তাহলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। আইএলও জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা, এর কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশনসমূহ খুবই গুরুত্ব বহন করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে। বাংলাদেশ এযাবৎ ৩৫টি কনভেনশন অনুসমর্থন (রেটিফাইড) করেছে। এর ভেতর প্রথম কনভেনশনটি সবচেয়ে আলোচিত যা মহান মে দিবসের আন্দোলনের ফসল। এর শিরোনাম 'কনভেনশন নং-১ কাজের সময় (শিল্প) কনভেনশন ১৯১৯'। বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আইএলও'র কোর কনভেনশনের মধ্যে আরো রয়েছে কনভেনশন নং-৮৭ : সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন ১৯৪৮; কনভেনশন নং-৯৮ : সংগঠন করার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন ১৯৪৮; কনভেনশন নং-১৮২ : ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন ১৯৯৯ প্রভৃতি।

এক থেকে একবিংশ অধ্যায়ব্যাপী ৩৫৪ ধারা সংবলিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ জারি এবং একাধিক সংশোধনী হওয়ার পরও একটি বিধিমালার জন্য বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সুদীর্ঘকাল। অবশেষে জারি করা হয় বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ যার সর্বমোট বিধির সংখ্যা ৩৬৭টি এবং ১ থেকে ৭টি তফশিল ও ফরম আছে ৮০টি। এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আর একটি বিধিমালা সেই সাথে উল্লেখযোগ্য তাহলো বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০১০, যার একটি সংশোধনী আনা হয়েছে ২০১৫ সালে। তবে তার আগেই প্রণীত হয়েছিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬। আর একটি নতুন প্রণীত আইনও উল্লেখ করা যায়, তা হচ্ছে অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন ২০২০।

বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের একটি বড়ো কারণ শিশুশ্রম। বর্তমানে ১৫২ মিলিয়ন শিশু পৃথিবীজুড়ে শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, তার মধ্যে ৭৩ মিলিয়নই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত। বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের ৪.৭ মিলিয়নের বেশি শিশু শিশুশ্রমে জড়িত এবং ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সিদের মধ্যে এই সংখ্যা ৭.৪ মিলিয়ন (সূত্র : ইউনিসেফ)। অবশ্য এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে বহুল প্রতীক্ষিত 'শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০'। প্রণীত হয়েছে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫'।

উল্লিখিত নীতিমালা ছাড়াও রয়েছে– 'রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০'; 'গ্রিন, ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা ২০২০'; 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি নীতিমালা ২০১৩'।

বাংলাদেশের শ্রমক্ষেত্রে যত নীতি, আইন, বিধিমালা, নীতিমালা রয়েছে তা মূলত দেশের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা তথা শ্রমক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমমান রক্ষার তাগিদে প্রণীত ও জারিকৃত। শ্রমকল্যাণ যেমন এখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাথে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে শিল্প সম্পর্ক। প্রতিবছর মে দিবস পালিত হচ্ছে, প্রতিবছর নিত্য নতুন প্রতিপাদ্য স্লোগান হিসেবে গৃহীত হচ্ছে, আইএলও ত্রিপক্ষীয় সভা করছে। সকল নীতি, আইন, বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগই কেবল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প 'শোভন (ডিসেন্ট) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান' এই লক্ষ্য পূরণে সময়ের চাকা গড়িয়ে চলেছে সামনের পানে। মহান মে দিবস সে রূপকল্পের কথা বারে বারে মনে করিয়ে দেয়।

স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বাংলাদেশের শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দেশে দেশে মহান মে দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটের সংখ্যা প্রচুর।

একদিন নিশ্চয়ই মহান মে দিবসের প্রেরণা সকল নীতি-পরিকল্পনা-কর্মে প্রতিফলিত হবে এবং বাংলাদেশের সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণি পাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শোভন কর্মপরিবেশ ও উন্নত জীবনমান– মহান মে দিবসের এটিই প্রত্যাশা।

লেখক: গবেষক, গ্রন্থকার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীসমাজ

ড. মোহাম্মদ হাননান

১৯৪৭-১৯৭০ এবং ১৯৭১-২০২১, প্রায় পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস আছে বাংলাদেশের নারীসমাজের। একদিনেই বাংলাদেশের নারী সফলতা পায়নি, ধাপে ধাপে এগিয়েছে বাংলাদেশ। তেমনি ঘাটে ঘাটে বাধা ডিঙিয়ে একটা সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশের নারীসমাজ। এখন শুধু দেশে নয়, বিশ্বেও এটা এখন আলোচিত একটি বিষয়।

কোথায় ছিল বাংলাদেশের নারীসমাজ! অবস্থানটা বোঝার জন্য লেখক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের একটি বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করছি। দৃশ্যটা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের। মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে নারীরা ভোট দিতে যাচ্ছে কেমন করে দেখুন:

> জনগণের উৎসাহ পল্লী গ্রামের নারী জাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। আমার নিজের এলাকায় দেখিয়াছি পর্দা রক্ষা করিয়াও দলে দলে মেয়েরা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে। পর্দা রক্ষার জন্য তারা এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; চারজন যুবক একটা মশারির চারকোনা ধরিয়াছে। পনের বিশ জন মেয়ে ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি ঘিচি করিয়া ঢুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে। মশারির মধ্যে মেয়েরা চলিয়াছে। ...এতে ভোটের ফলাফল আগেই বুঝা গিয়াছিল। ভোটাররা এই ভোটযুদ্ধকে একটা পবিত্র জেহাদ মনে করিয়াছে। [আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা-২০১৭, পৃষ্ঠা: ২৭৩]।

খুব সহজ ছিল না সেদিন নারীর জীবন। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে বিপ্লবে অংশ নিতে পিছপা হয়নি। এ নারীরাই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। সম্মুখ সমরে সরাসরি নারীদের লড়াই করার অভিজ্ঞতাটা খুব বেশি দেশে নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নারীসমাজ সমানতালে পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন, শহিদ হয়েছেন।

বাংলাদেশের সেই নারীসমাজ বর্তমানে দেশের জিডিপি'তে সরাসরি ২০% অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর পর্যবেক্ষণ আমলে নিলে পরিবারের ভেতরে-বাইরে কাজের মূল্য হিসাবে নারীর অবদান ৪৮% (প্রায় অর্ধেক) মানতেই হবে।

গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বর্তমানে ৩৮%। কিন্তু এদের অধিকাংশই মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। ১৯৭৪ সালে এদেশের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪%। বর্তমানে দেশে ৬ কোটি ৮ লাখ মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন, যার মধ্যে নারী ১ কোটি ৮৭ লাখ। আমরা বলতে পারি প্রায় ২ কোটি নারী বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে একটা বড়ো জনশক্তি হিসেবে দুয়ারে কড়া নাড়ছে। নারীদের মধ্যে শ্রমজীবী সমাজেরই আধিক্য থাকলেও শিক্ষকতা, ব্যাংক সেবা, চিকিৎসা, ব্যাবসাবাণিজ্য, উদ্যোক্তা ইত্যাদিতেও নারীদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি আইসিসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের নারীরা এখন টেস্ট ক্রিকেটও খেলবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশজ উৎপাদনে পোশাক খাতের অবদান বড়ো করে দেখানো হয় (প্রায় ১১.১৭ শতাংশ)। প্রায় ৪০ লাখ জনশক্তি এখানে নিয়োজিত, যার ৫৯.১২ শতাংশ হচ্ছে নারী। এভাবে প্রায় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ নারী কৃষি, শিল্প ও নানারকম সেবা খাতে কাজ করে দেশের অর্থনীতির ভিতে দারুণ এক গতি সঞ্চার করে চলেছে, যা মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণেরই স্মৃতিবাহী।

বাংলাদেশের নারীদের গড় আয়ু এখন ৭৫ বছর, আর পাশাপাশি পুরুষের গড় আয়ু ৭১ বছর। এটা জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-এর ২০২১ সালের প্রতিবেদনের তথ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবটায় সামান্য বেশকম আছে। সেখানে নারীর গড় আয়ু ৭৪.২ বছর, আর পুরুষের ৭১.১ বছর। এ পার্থক্যটা সামান্যই। তবে নারীর গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় মোট দেশজ উৎপাদনেও এর প্রভাবটা সুদূরপ্রসারী।

দেশে এখন প্রায় ১৭ কোটি মানুষ রয়েছে এবং এদেশে ১.১ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। স্বাধীনতার পরপর এ হার ছিল ৬.৯। এসময় বাংলাদেশের একজন মা গড়ে ছয় থেকে সাত জন সন্তান জন্ম দিতেন। কোথাও কোথাও বিশেষ করে গ্রাম ও চরাঞ্চলে জন্মহার আরো বেশি ছিল। মানুষ বর্তমানে অর্থনীতির সুরক্ষা পেতে পরিবার ছোটো করছে। কিন্তু বাংলাদেশে বড়ো পরিবারও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সারা বিশ্ব থেকে মাসে মাসে যে রেমিট্যান্স আসে, গ্রামীণ অর্থনীতি যে কারণে এখন আগের তুলনায় সুডোল-সুঠাম তার একটা ভূমিকা বড়ো পরিবার থেকেও এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য একটি ভাষণে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে 'জনশক্তি এবং জনসম্পদ' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে মায়ের তথা নারীর আত্মত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা।

বাংলাদেশের কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত বেড়ে চলেছে দেখে অর্থনীতিবিদরা এটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-২০১৭ অনুসারে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ নারী কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ কঠিন জীবনব্যবস্থার নিদর্শন। জমিতে ফসল ফলানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া কঠিন এক শ্রম ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাশাপাশি নির্মাণ শিল্পে ইটভাঙা, মাথায় করে বালু টানা, ইট মাথায় করে বহন করা নারীদের জন্য কষ্টকর। অর্থনীতিবিদরা এগুলোর জন্য শ্লাঘা অনুভব করেন। আমাদের দেশে নৃগোষ্ঠীর নারীদের মধ্যে কঠিন কাজগুলো করার একটা প্রথা পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমতলের নারীদের জন্য এগুলো নতুন বিষয়। আমাদের পরিকল্পনাবিদরা নারীদের জন্য সহনশীল কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারেননি। অর্থনীতিবিদরা নারীর এসব কঠিন কাজে অংশগ্রহণ দেখে বাহবা দিয়ে থাকেন এবং বলতে থাকেন অত ভাগ নারী এখন শ্রমবাজারে অংশ নিচ্ছে।

আমাদের মুরগি খামার, পশু পালন প্রকল্প, গাড়ি চালনা, পোশাক খাত, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে মেয়েদের বেশি বেশি অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে বিশাল কর্মজগৎ নারীদের জন্য তৈরি হতে পারত তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা ভাবছেন না, সুপারিশ তৈরি করছেন না। কর্মজীবী নারীদের মধ্যে ৫৯.৭ শতাংশ যে কৃষিতে যুক্ত আছেন (যেখানে পুরুষ মজুর রয়েছে ৩২.২ শতাংশ)– এটা কিন্তু সাম্যের বিচারে অন্যায়। মেয়েদের জন্য কঠিন শারীরিক কাজ নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা সরাসরি অংশ নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে, তাদের সে সম্মান জাতি ও রাষ্ট্রকে দিতে হবে। পুরুষরা নরম নরম কাজগুলো আরাম করে নিজেদের জন্য রাখবেন অথবা নিজে ঘরে বসে পুরুষ তার নারীকে কঠিন কাজের জন্য বাইরে পাঠিয়ে দেবে, এটা স্বাধীনতার সুফল নয়। অর্থনীতিবিদরা নারীদের সর্বত্র মজুরি-শ্রমে আসতে দেখে উল্লসিত হন, কিন্তু নারীদের জন্য সে শ্রমকে সহজ-সরল করে দিতে হবে। এটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুরও আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলে গেছেন, 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে'। [জাতির উদ্দেশে জাতির পিতার ভাষণ, ২৬শে মার্চ ১৯৭২]।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

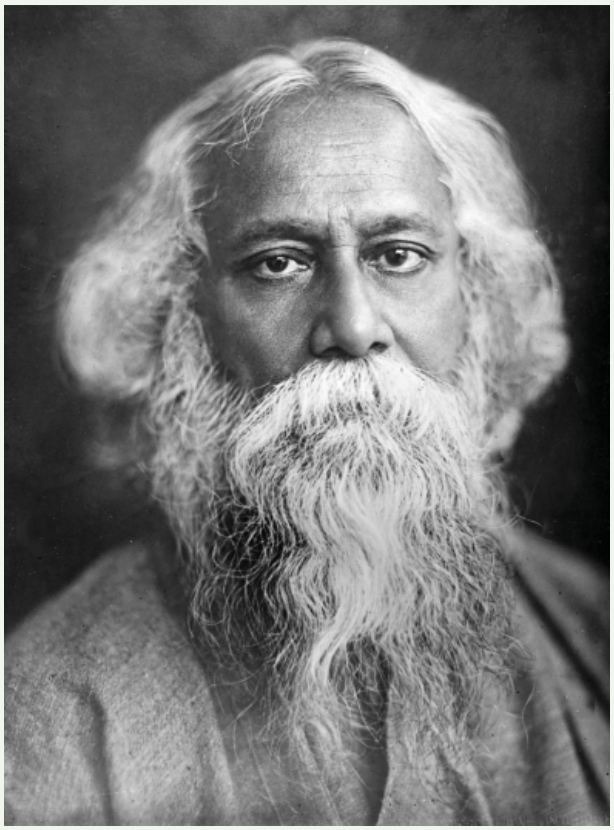

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রভাব

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন– 'রবীন্দ্রনাথের কোনো বাধা নেই– আর এই খানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক– তিনি সব সময় দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!' রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কত ব্যাপক, তা বোঝা যায় তখন, যখন দেখি রবীন্দ্রনাথের বাক্যবন্ধ ধার করেই বুদ্ধদেবকে নির্মাণ করতে হয় তাঁর বিবেচনা। বস্তুত রবীন্দ্রোত্তর কালে এমন কোনো বাংলাভাষী লেখক নেই, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হননি? এই প্রভাব কখনো পড়েছে সাহিত্যের ভাবপরিমণ্ডল সৃজনক্ষেত্রে, কখনো সংগঠন নির্মাণে, কখনো-বা আঙ্গিক নির্মিতিতে। লেখার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো কোনো সাহিত্যিক রবীন্দ্র প্রভাব বলয় থেকে কখনোই মুক্তি পাননি, আবার কেউবা নির্মাণ করে নিয়েছেন নিজস্ব ভুবন।

দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে নানা বিষয়ে বিবিধ আঙ্গিকে সাহিত্যচর্চা করলেও রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কালে যারা কবিতা লিখেছেন, যারা পরিচিতি পেয়েছেন রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসেবে, তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং একইসঙ্গে অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাঙালি কবির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল উপদ্রবের মতো। কিন্তু প্রলোভন দুর্দম হলেও রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ তাঁদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। ফলে তাঁর প্রবল দীপ্তির জোয়ারে অনেকেই হারিয়ে গেছেন, অনেকেই নির্মাণ করতে পারেননি নিজস্ব কোনো দ্বীপভূমি। প্রায় সকলেই এদিক-সেদিক ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা-উপনিবেশেই আশ্রয় নিয়েছেন, রাবীন্দ্রিক কবিতাকাশেই তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সাধনার শ্রেষ্ঠ তারামালা। রবীন্দ্র-বলয়বন্দি এই কবিদের মধ্যে আছেন– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। বলতে দ্বিধা নেই, কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এরা মূলত রবিশস্যেই লালিত-পালিত-বর্ধিত। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার কিংবা অতিক্রমের স্পর্ধিত কোনো প্রয়াস এঁদের ছিল না, উনিশ শতকে রবীন্দ্র-রোমান্টিকতাই তাঁরা চর্চা করলেন, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও– 'বলাকা'-উত্তর রবীন্দ্র কবিতা আত্মীকরণেও তাঁরা হলেন ব্যর্থ। দেশ-কালের দ্বন্দ্ব ও সংক্ষোভ, সভ্যতার সংকট তাঁদের বিচলিত করেনি, তাই রাবীন্দ্রিক স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিলোকে এঁরা নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে নির্মাণ করেছেন কবিতার পর কবিতা। বস্তুত, তাঁদের এই পরিণাম ছিল ইতিহাস-নির্ধারিত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় বুদ্ধদেব বসুর নিম্নোক্ত ভাষ্য:

> বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা– যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদগত হয়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন– তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা করে চেনা যায় না– আর সত্যেন্দ্র দত্তও যে শেষ পর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হয়ে থাকলেন– এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ত্রিশোত্তর কবিদের রবীন্দ্র বিরোধিতার কথা বহুল প্রচারিত। প্রবল-প্রাণ তিরিশি কবিদের সচেতন রবীন্দ্র বিরোধিতা কি পরোক্ষে রবীন্দ্র প্রভাবেরই নির্ভুল স্বাক্ষর নয়? প্রভাব না পড়লে তাঁকে অতিক্রমণের বাসনা জাগ্রত হয় কীভাবে? লক্ষ করলেই দেখা যাবে তিরিশের কবিরা যখন চল্লিশে পা রাখলেন, তখন রবীন্দ্র বিরোধিতার পরিবর্তে তাদের কবিতায় এল রবীন্দ্রস্মরণ। কেউ কবিতা সংকলনের নামকরণ করলেন *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ*, কেউবা রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে ঋণ করে নির্বাচন করছেন গ্রন্থনাম, কেউবা রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে প্রকাশ করেছেন সার্বভৌম ঐ কবির প্রতি গভীর আনুগত্য।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় পিনাকেশ সরকারের এই অভিমত:

> চতুর্থ দশকের তরুণ এই কবিবৃন্দের প্রায় সকলেরই কাব্য প্রেরণা গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের দ্বারা। বিদেশি কবিতার নানা উপাদানকে সময় থেকে সময়ান্তরে ব্যবহার করলেও, রবীন্দ্র প্রভাব তাঁরা কেউই প্রায় অস্বীকার করতে পারেননি তাঁদের প্রাথমিক কাব্যপ্রয়াসে, আর সেটিই ছিল খুব স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। বুদ্ধদেব বসুর *মর্মবাণী*, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *তন্বী* কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে অমিয় চক্রবর্তীর প্রাথমিক

কাব্যচর্চায় রবীন্দ্রানুসরণ খুবই স্পষ্ট। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *প্রথমা* কাব্যের কবিতায় রাবীন্দ্রিক মানবতাবাদেরই নতুন বিন্যাস। এমনকি জীবনানন্দের *ঝরাপালক* কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষণীয়।

ত্রিশোত্তর কবিরা রবীন্দ্রনাথ দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত ছিলেন তার দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে তিনটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি। দেখা যাবে তিনটি কবিতাংশেই রবীন্দ্রনাথ হাজির আছেন প্রবলভাবে:

ক. হে মোর জীবন দেবতা,
আমার পরানে নিভৃত গোপনে
কি এনেছ তুমি বারতা?
কি কথা কহিছ বুঝিতে না পারি
শুধু অনিমেষে তোমায় নেহারি
আমার পিয়াসী নয়ন ভরিয়া–
হে মোর দেবতা বুঝিতে না পারি
(বুদ্ধদেব বসু/ 'জীবনদেবতা')

খ. আজও চলে একা পথে অভিসারিকা,
দ্বিধাকম্পিত হাতে প্রদীপশিখা।
আকাশে বিজুলি হানে,
ত্রস্ত সলাজ প্রাণে
মুখে গুণ্ঠন টানে ভীরু বালিকা।
আজও চলে একা পথে অভিসারিকা।
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত/ 'পলাতকা')

গ. চুপে চুপে যে কথাটি
শিখাইছে মাটি
প্রতি নবাঙ্কুরে
ইঙ্গিতে যে কথাটিরে গ্রহতারা বলে ঘুরে ঘুরে
আলোকের অর্ধস্ফুট সুরে,
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে
যে কথাটি ছিল সঙ্গোপনে,
সে গোপন বরতাটি করিব প্রকাশ,
এল নারী, এল আজ জীবনের দখিনা-বাতাস।
(প্রেমেন্দ্র মিত্র/ 'যৌবন বারতা')

–উপর্যুক্ত তিনটি কবিতাংশেই রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার নিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। তিরিশি কবিদের রূপনির্মাণে, কোথাও কোথাও ভাবপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রপ্রেরণা খুবই স্পষ্ট। সুধীন্দ্রনাথ আর বুদ্ধদেবের দুটি উদ্ধৃতির সাহায্যে আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি:

ক. 'তন্বী' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে
অর্ঘ্য
ঋণ শোধের জন্য নয় স্বীকারের জন্য
–অতঃপর মুখবন্ধের এই পরম স্বীকারোক্তি:
সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি
কোনখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের
রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া
প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্য আমি লজ্জিত
নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের
পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু
রূপজ্ঞ বটে।

খ. 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন:
রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পরে
কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবনঋতু,
সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে যেসব প্রান্তে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় নিম্নবর্গের জীবন চিত্রায়ণ, আদিবাসী জীবনের প্রতি ভালোবাসা, রাজনীতি সচেতনতা, কবিভাষা, ছন্দোপরীক্ষা প্রভৃতি প্রবণতা। বর্তমান সময়ে বাংলা কবিতায় নিম্নবর্গ এবং আদিবাসী জীবন বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ *পুনশ্চ* কাব্যে আদিবাসী জীবন নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে। তাঁর রাজনীতি সচেতনতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকা, উত্তরকালে তাই বাংলা কবিতায় মহিরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতার প্রত্যুত্তরে যখন লেখেন '১৪০০ সাল' নামের কবিতা, তখনো তো ভিন্নমাত্রিক এক প্রভাবের কথা আমরা মনে করতে পারি। উত্তরকালীন বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন কবি ভাষা দিয়ে। বাংলা কবিতায় এখনো রবীন্দ্র কবি ভাষার বিপুল প্রভাব প্রবহমান, এখনো অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের কবি ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নানামাত্রিক ছন্দোপরীক্ষার কথাও আমরা উল্লেখ করতে পারি। *বলাকা* কাব্যের মুক্তক ছন্দ, আর *পুনশ্চ*-এর গদ্যছন্দই তো এখন বাঙালি কবির ভাবপ্রকাশের বিকল্পহীন অবলম্বন। কবিতায় চিত্রলতার যে প্রকাশ, যা ব্যাপকভাবে দেখা যায় জীবনানন্দ দাশের কবিতায়, সেখানেও আছে রবীন্দ্রনাথের অলক্ষণীয় প্রভাব। কবিতায় আন্তর্জাতিক ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিও আমরা রবীন্দ্র কবিতাতেই প্রথম লক্ষ করি। স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের *আফ্রিকা* কবিতা রচনার পর তৈরি হয় বুদ্ধদেবের 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'। *লিপিকা* ও *পুনশ্চ* কাব্যে কবিতায় গল্প বলার যে ঢং তা-ও আমাদের শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উত্তরকালে যা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে। এভাবে দেখা যায়, রবীন্দ্র উত্তরকালে বাংলা কবিতার ভাব-পরিমণ্ডল সংগঠন নির্মিতি এবং কবি ভাষা– সর্বত্রই প্রবলভাবে উপস্থিত আছেন পরাক্রমশালী রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। তাঁর আগে ছোটোগল্প লেখা হলেও, যথার্থ ছোটোগল্প বলতে যা বুঝায়, তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটোগল্পের সংগঠন-শৈলী, অন্তিম ব্যঞ্জনা, ভাষারীতি– যে-কোনো দৃষ্টিকোণেই উত্তরকালীন লেখকদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সমুদ্রপ্রতিম। এ কালে বাংলা ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের জীবন চিত্রায়ণের যে প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়, তার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র ছোটোগল্পে। এ প্রসঙ্গে 'শাস্তি', 'একটি মুসলমানী গল্প', 'মাস্টারমশাই' এসব রচনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। আজ থেকে একশ ত্রিশ বছর আগে দুখিরাম-ছিদাম-রাধা-চন্দরাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'শাস্তি' নামের যে গল্প লিখেছেন, তা এখনো বাঙালির গল্পকারদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। এ যুগের ছোটোগল্পে নারী ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের যে প্রয়াস লক্ষ করা

যায়, সেখানেও দেখি রবীন্দ্রনাথের অতুল প্রভাব। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় তাঁর 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পের কথা। এসব গল্পে শিল্পিতা পেয়েছে প্রথা ও সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ এবং সকল সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। 'রবিবার' কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের বিজ্ঞানচেতনতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ না রেখে, তাকে সামাজিক লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের এসব বৈশিষ্ট্যই উত্তরকালীন বাংলা ছোটোগল্পে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক মানুষের বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গতা যুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটোগল্পের একটি প্রধান অনুষঙ্গ। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা উন্মোচনে রবীন্দ্র ছোটোগল্পই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রয়াস। যুগলের নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটোগল্পের নরনারীকে বিচিত্র জীবন-জটিলতার সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটোগল্পে অনেক সময়েই সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণের সূত্র ধরে উপস্থিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাকে এক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই, তবু দাম্পত্য-পঙ্গুতার রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগ্নতার জায়মান বীজটিকে গল্পগুচ্ছে আমরা যেন হঠাৎ করেই পেয়ে যাই। নরনারীর বিযুক্তি ও বিয়োগ রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে আমরা লক্ষ করি। শারীরিক পঙ্গুতায় আসে দুরতিক্রম্য ব্যবধান ('দৃষ্টিদান'), শারীরিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও তৃতীয় মানুষের অস্তিত্ব এসে যুগলের মাঝখানে নির্মাণ করে মেরুদূর মানসিক বিচ্ছিন্নতা (মধ্যবর্তিনী), ব্যক্তিত্বের সংঘাতে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে গভীর একাকিত্ব ও নৈরাশ্যময় নিঃসঙ্গতা (স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, পয়লা নম্বর), একজনের ঔদাসীন্য অপরের চিত্তে সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা (নষ্টনীড়)– এসব বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্র ছোটোগল্পে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা হয়েছে চিত্রিত। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের এই বৈশিষ্ট্য উত্তরকালীন বাংলা গল্পকারদের কাছে একটি প্রিয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ছোটোগল্পের ভাষা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন তাঁর পরবর্তী লেখকদের ওপর। বাংলা ছোটোগল্পের ভাষা তো রবীন্দ্রনাথের আপন হাতের সৃষ্টি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় তাঁর এই ভাষ্য– 'গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যেসব বিদেশি লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হত জানি নে।' এই যে আপন সাধনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করলেন ছোটোগল্পের ভাষা সামান্য ব্যতিক্রম বাদে, সে ভাষাতেই এখনো লেখা হচ্ছে বাংলা ছোটোগল্প। বিষয়াংশ নির্বাচন কিংবা দৃষ্টিকোণ পরিচর্যা, প্রকরণ-প্রকৌশল– যে-কোনো ক্ষেত্রে দেখি, ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ অলক্ষে এসে হাজির হন উত্তরকালীন বাঙালি গল্পকথকদের কাছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রভাবে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক উপন্যাসে মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে ধারা, তার সূত্রপাত ঘটে রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*-তে। রাজনীতি সচেতনতা, প্রাগ্রসর প্রেমচেতনা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট– বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক উপন্যাসের এসব চারিত্র্যের উৎস হিসেবে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়*, *গোরা*, *যোগাযোগ*, *শেষের কবিতা* প্রভৃতি উপন্যাস। মনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি দেশ ও সমাজ সম্পর্কে এসব উপন্যাসে যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী লেখকেরা তা থেকে পৌনঃপুনিক গ্রহণ করেছেন তাদের রচনা রসদ। উপন্যাসের বক্তব্যের পাশাপাশি আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষাপটে *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। এই উপন্যাসে চারজন মানুষের স্বতন্ত্র বয়ানকে যেভাবে একাত্ম করে নেওয়া হয়েছে, উত্তরকালীন ঔপন্যাসিকেরা মানব প্রতিবেদন নির্মাণে, আখ্যান সৃষ্টিতে সেখান থেকে অবিরাম চয়ন করেছেন শিল্পরস। আধুনিক মানুষের অতলান্ত শূন্যতার শিল্প হিসেবে *দুই বোন* উত্তরকালে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রভাব সাগরের মতো বিশাল, আকাশের মতো সীমাহীন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের যে ভাষা বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করলেন, শতাব্দীব্যাপী তাই অবলীলায় অনুসৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। তবে মৌল প্রবণতার কথা মেনে নিলে উপর্যুক্ত অভিমত স্বীকার করতেই হয়। *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের ভাষাই উত্তরকালে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের ভাষা সাধু, কিন্তু সাধুরীতির অন্তরালে এখানে আছে কথা ভাষার লঘুতা ও প্রবহমানতা। রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের অধিকাংশ উপন্যাসই আত্মকথনমূলক বা নিজ জবানিতে লেখা। উত্তম-পুরুষেরা নিজ জবানিতে কোনো কিছু বর্ণনা করতে গেলে স্বভাবতই প্রাধান্য পায় কথ্যরীতি। উত্তরজীবনে চলিত ভাষাকে উপন্যাস রচনার বাহন করার পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ যেন সম্পন্ন করলেন *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে– সাধুগদ্যের মাঝেই এখানে তিনি সঞ্চার করেছেন চলিতের দীপ্তি আর ঝলকানি আর প্রবহমানতা। উপন্যাস যে বর্ণনামূলক ডিসকোর্স, *চতুরঙ্গ*-এর ভাষা আর বর্ণনায় তা সম্যকরূপে উপলব্ধিযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্ব এখানে যে, উত্তরকালীন ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন কীভাবে লিখতে হবে, সে কথাও তিনি যেন অলক্ষে জানিয়ে দেন তাঁর পরবর্তীদের। এ প্রসঙ্গে *শেষের কবিতা*র ভাষার কথাও বলতে হয়। বস্তুত প্রেমের উপন্যাসের ভাষার আদর্শ রূপটাই যেন *শেষের কবিতা*। এ উপন্যাসের ভাষাদর্শ কীভাবে উত্তরকালীনদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে, বুদ্ধদেব বসুর বয়ানে তা ধরা পড়েছে এভাবে:

> সে সময়ে যেটা আমাদের মনে সবচেয়ে চমক লাগিয়েছিল সেটা *শেষের কবিতা*র ভাষা। অমন গতিশীল, অমন দ্যুতিময় ভাষা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি।... বাংলা এত সাবলীল হতে পারে, তাকে যে ইচ্ছেমতো বাঁকানো, হেলানো, দোমড়ানো, মোচড়ানো সম্ভব, আলোছায়ার এত সূক্ষ্ম স্তর তাতে ধরা পড়ে, খেলা করে ছন্দের এত বৈচিত্র্য, তা আমরা এর আগে ভাবতেও পারিনি। তাই এই বইটি হাতে পেয়ে যদি আমাদের মনের অবস্থা চ্যামম্যানের হোমর পাঠান্তে কীটসের মতো হয়ে থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

নাটকের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। 'বিসর্জন' নাটকের প্রাগ্রসর ধর্মবোধ, মুক্তধারার 'গতিশীলতা', 'রক্তকরবী'-র রাজনীতি সচেতনতা বাংলা নাটককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একালের নাটকে যে প্রাগ্রসর সমাজসচেতনতা, তার সূত্রপাত ঘটেছে 'রক্তকরবী'তে– একথা বললে কি কোনো অত্যুক্তি হবে? ঔপনিবেশিক নাট্যফর্ম ভেঙে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে আশ্রয় করেছিলেন ঐতিহ্যিক নাট্যরীতি। তাঁর নাটকে সংগীত, নৃত্য ও সংলাপের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বাংলা লোকনাটকের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। একালে যে বর্ণনামূলক নাটকের কথা বলা হয়, তার প্রাথমিক প্রয়াস কি 'রক্তকরবী' নয়? নাট্যসংলাপের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ

আছেন সদাজাগ্রত। নাটক যে মঞ্চের শিল্প, মঞ্চই যে তার পরম গন্তব্য– সেক্ষেত্রেও আমাদের স্মরণ করতে হবে রবীন্দ্রনাথকে। মঞ্চকলা নির্মাণেও তিনি প্রভাবিত করেন তাঁর উত্তরকালীনদের। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করব 'তপতী' নাটকের ভূমিকা, স্মরণ করব 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ।

নাট্য-আঙ্গিক সৃজনেও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ব্যাপক। এরিস্টটলীয় রীতিতে নাটক লিখেছেন তিনি, আবার তিনিই ভেঙে দিয়েছেন সনাতন সব নাট্য আঙ্গিক। লিখেছেন একাঙ্ক নাটক, এক চরিত্রের নাটক, লিখেছেন কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য। উত্তরকালীন নাট্যকারদের পথটাকে খুব কঠিন করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নাকি সহজ? তাঁর প্রভাবকে অতিক্রম করা কি একালের এবং অনাগতকালের কোনো নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব?

বিষয়াংশ ও ভাষারীতি– উভয় দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য ও উত্তরকালীনদের কাছে বিস্তার করেছে মোহনীয় প্রভাব। একথা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই, তিনিই বাংলা প্রবন্ধের জনয়িতা। তাঁর প্রবন্ধ তত্ত্বভারমুক্ত, পাঠকের সঙ্গে তাঁর ঘটে সেখানে সহজ আত্মীয়তা। মিলনের বাসনাই রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের মৌল বাণী। প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য নির্মাণ করেছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য উপযোগিতা, শিল্পিতা ও যুক্তিবাদিতা। সন্দেহ নেই, এসব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী লেখকদের কাজে সঞ্চার করেছে অনেকান্ত সহযোগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে একশ ষাট বছর পূর্বে। তাঁর জীবনের অর্ধেকটা কেটেছে উনিশ শতকে, বাকি অর্ধেক বিশ শতকে। এখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে বইছে একুশ শতকের তৃতীয় দশকের হাওয়া। পৃথিবীজুড়ে কত পরিবর্তনই না ঘটেছে বিগত দেড়শ বছরে। তবু রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে থেকে গেছেন, হয়ে উঠেছেন নির্ভর এক আশ্রয়, অফুরান এক আশ্বাস। আজকে আমরা কেন্দ্র প্রান্তের কথা বলি, কামনা করি প্রান্তের অভ্যুত্থান– শতবর্ষ পূর্বে শিলাইদহ-শাজাদপুর-পতিসর জীবনে সে কাজটাই করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা আন্তর্জাতিক চেতনার কথা বলি, বিসর্জন দিতে চাই জাতিক চেতনা। রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন, জাতিক না হলে আন্তর্জাতিক হওয়া যায় না। লন্ডন থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ শিকড় সঞ্চার করেছেন শিলাইদহ-শাজাদপুর-পতিসর-শ্রীনিকেতনের মৃত্তিকায়– একালে আমরা প্রান্তের শিকড় উন্মূলিত করে বাসা বাঁধতে চাই কেন্দ্রে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে একালে আমরা বৃদ্ধি করে চলেছি কংক্রিট-সভ্যতা, অথচ সোয়াশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক।

সাহিত্যের নানা আঙ্গিক বা ফর্মকে ভেঙে একালে যে ভাবনা উচ্চারিত হয়, রবীন্দ্রনাথের রচনায় শতবর্ষ পূর্বেই আমরা পাই সেই ফর্মহীনতার ধারণা। তাঁর নাটকে আছে সংগীত ও নৃত্যের খেলা; তাঁর ছোটোগল্পে ও কবিতায় আছে নাটকের ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটোগল্পই তো নাটকের এক একটা অসমাপ্ত টেকস্ট। তাঁর উত্তরপর্বের কবিতাতে আছে চিত্রশিল্পীর তুলির টান, আছে ছোটো গল্পকারদের প্রতিভার স্পর্শ।

একালে আমরা বৃক্ষরোপণের কথা বলি, পরিবেশের কথা বলি– অথচ শতবর্ষ পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ উড়িয়েছেন মরু বিজয়ের কেতন। পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা একালে যে বৃক্ষরোপণের কথা বলি, সেই 'বৃক্ষরোপণ' শব্দটাও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বিবেচনা করেছেন মানব উন্নয়নের প্রযুক্তি হিসেবে, আমরা আজ শিক্ষাকে বানিয়েছি পণ্য। যে ক্ষুদ্রঋণের কথা আজ পৃথিবীজুড়ে উচ্চারিত, তার প্রাথমিক ধারণা তো রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমরা পাই। কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, জলসেচ ভাবনা, পল্লি উন্নয়ন কার্যক্রম– কতভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ নিয়ত আমাদের প্রভাবিত করে চলেছেন, প্রভাবিত ও প্রাণিত হতে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। আমাদের চিত্তলোকে দুঃখ-সৃজন আর শুশ্রূষা প্রদানে রবীন্দ্রনাথের গান তো অবিরাম কাজ করে চলেছে। তাঁর সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, তাঁর দর্শন, তাঁর ভাবনা, তাঁর চিঠিপত্র কোন দিকটা বাদ দিয়ে চলে আমাদের একদিন? কোনো বাঙালি কি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কাটাতে পারেন পূর্ণ একটা দিন? এমন কোনো বাঙালি লেখক আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করে, কিংবা তাঁর প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে সাহিত্যচর্চা করেন? নামের মধ্যেই আছে ঐ প্রভাবের সূত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় নক্ষত্রপুঞ্জ, সাহিত্যের উত্তরকালীন লেখকেরাও রবীন্দ্রনাথ নামক সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেই হয়ে উঠেছেন এক একজন নবীন নক্ষত্র।

রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছেন আজ থেকে ঠিক ৮০ বছর পূর্বে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে তাঁর উপর্যুক্ত প্রভাবের কথা স্মরণ করলে আমাদের মনে হয় তিনি এখনো আছেন আমাদের সাথে– নিয়ত তিনি সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছেন বাঙালি লেখকদের। রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্র সাহিত্যকে বাঙালি লেখক এবং সংস্কৃতিচিন্তকরা যতই ব্যবহার করতে পারবেন– বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ততই সদর্থক চেতনায় হবে উন্নত, হবে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করা, তাঁকে আত্মীকরণ করাই এখন আমাদের শৈল্পিক দায়িত্ব। তাঁর মৃত্যুর আশিতম বর্ষে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার– আমরা বুঝতে চাই রবীন্দ্রনাথকে, নিজেদের বিকশিত করার জন্য চাই তাঁর অনেকান্ত সহযোগ, তিনি প্রতিদিন হয়ে উঠুন আমাদের সঙ্গী– আমাদের জীবন হোক রবীন্দ্রময়।

লেখক: উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

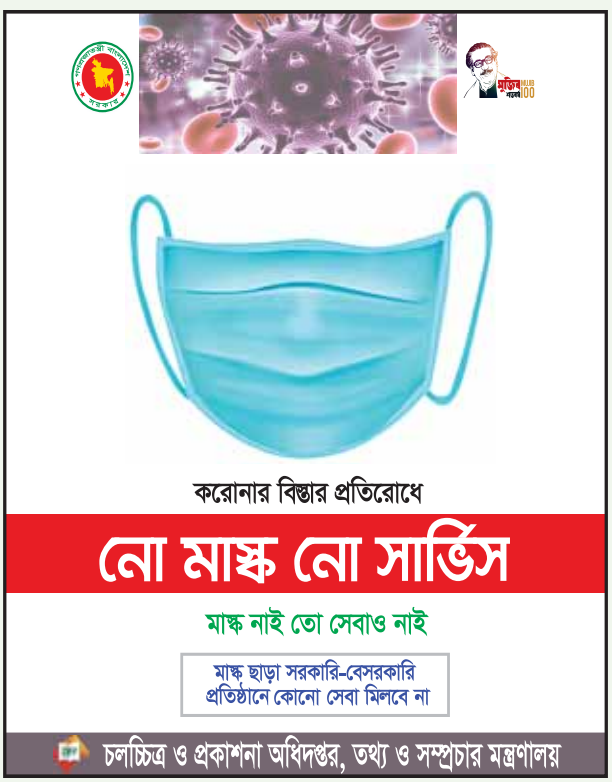

দুঃসহ স্মৃতি

১৯৭১ গণহত্যা-ডেমরা

স. ম. গোলাম কিবরিয়া

১৪ই মে ১৯৭১। অবিরাম গুলির শব্দ! চারদিকে হইচই আর চিৎকার! আতঙ্কিতভাবে ঘুম ভাঙল। মা এসে জামা পরে নিতে বললেন। বললেন, মিলিটারি এসেছে, পালাতে হবে বাবা। প্রতিবেশীদের হইচই আর চিৎকারে মনে হচ্ছে খুব কাছেই কিছু হয়েছে। যেন আমাদের গ্রামেই গুলির শব্দ হচ্ছে। বোতাম লাগাতে লাগাতেই ঘর থেকে টেনে বের করলেন মা। তাঁর হাতের সিদ্ধ মিষ্টি আলু দ্রুত খাইয়ে দিলেন। বাড়ির সবাই উঠানে দাঁড়িয়ে। সবার হাতেই জরুরি জিনিসের পোটলা। বাড়ি জ্বালিয়ে দিলেও জরুরি জিনিসগুলো যাতে রক্ষা পায়। আমাদের হাউলা (বছর চুক্তিতে নিয়োজিত কামলা, যিনি জমি চাষের বিষয়ে দেখভাল করেন) সোহরাব ভাইয়ের মাথায় বড়ো একটা বাক্স। জন্মের পর থেকেই তাকে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে দেখছি। সে এখন যেন এ বাড়িরই একজন।

সবাই আতঙ্কিত, গুলির শব্দে বার বার চমকে উঠছে। এত কাছে মনে হচ্ছে যেন শরীরে গুলি লাগবে। গোলাগুলির এত শব্দ এই অজপাড়াগাঁয়ের কেউ কখনো শুনেনি। এর মাঝেই দৌড়ে পালাতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে বের হয়েই দেখলাম সবাই যে যেদিকে পারে ছুটছে। কোন দিকে ছুটলে প্রাণ রক্ষা হবে কেউ জানে না। চিৎকার আর আর্তনাদে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। ডেমরা গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করেছে। আমাদের গ্রাম থেকে আড়াই-তিন কিলোমিটার দূরে। সবাই বলছে, নির্বিচারে মানুষ মারছে আর বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাড়খার করে দিচ্ছে। সেই শব্দ ভেসে আসছে আমাদের এখানে। কোন দিকে পালাতে হবে বুঝতে পারছে না কেউ। আমাদের গ্রামে যেদিন হানাদাররা এসেছিল সেদিন নদী পাড়ি দিয়ে দিঘুলিয়া গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাবা আজও নদীর ওপার যেতে বললেন। এ সময় একজন বললেন, পাকিস্তানি সৈন্য নদীপথে স্পিডবোটেও আসছে। তাই নৌকা নিয়ে নদী পাড়ি দেওয়া ঠিক হবে না। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের সুযোগ নেই। জীবন বাঁচানোই এখন জরুরি। তাই নদী পাড়ি না দিয়ে গ্রামের দক্ষিণ দিকে দৌড়াতে থাকলাম। ওদিকটাও বিপজ্জনক, কিন্তু উপায় নেই। কারণ গ্রামের দক্ষিণ দিকের রাস্তা ফরিদপুর-চাটমোহর গেছে, সে পথেই পাকিস্তানিরা বাঘাবাড়ি থেকে এসেছে।

শেষ রাতের দিকে বাঘাবাড়ি থেকে আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ডেমরা গিয়েছে। বাঘাবাড়ি তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্প। যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে ক্যাম্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নগরবাড়ি-দিনাজপুর (পঞ্চগড়) মহাসড়কে এখানে ফেরিঘাট। তাই এখানে সৈন্য সংখ্যাও বেশি থাকে। বাঘাবাড়ি-চাটমোহর সড়কটি জেলা পরিষদের কাঁচা রাস্তা। পাকিস্তানিরা পায়ে হেঁটেই এ পথে ডেমরা গিয়েছে। কখন ফিরবে তা বলা যাচ্ছে না। দক্ষিণ দিকে পালাতে গেলে রাস্তাটি অতিক্রম করতে হবে। রাস্তা অতিক্রম করলেই বিশাল খোলা মাঠ। পুরোটাই কৃষিজমি। কৃষিজমির ওপর দিয়েই শুরু হলো দৌড়ে পালানো।

খোলা মাঠে আসতেই দেখা গেল আগুনের লেলিহান শিখা, সেই সাথে গুলির শব্দ।

আগুনের ভয়াবহ শিখা দেখে সবার আতঙ্ক বেড়ে গেল। দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে সবাই। কিন্তু হাতে-কাঁধে অথবা মাথায় পোটলা নিয়ে আর কত দ্রুত হাঁটা যায়! বৈশাখ মাসের শুকনো মাটির ওপর খালি পায়ে হাঁটা। মনে হচ্ছিল পায়ের পাতা ফেটে যাচ্ছে। খালি পায়ে এই শুকনো ঢেলা মাটির ওপর দিয়ে আমাদের মতো বাচ্চাদের চলা চরম কষ্টকর। কিন্তু কোনো উপায় নেই। দ্রুত হাঁটছি আর পেছন ফিরে আগুনের শিখা দেখছি। কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলাম। পাকিস্তানিরা ফিরে আসার আগেই দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে হবে। না হলে খোলা মাঠে এত মানুষ দেখে আক্রমণ করতে পারে। চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দয়ারামপুর গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রামের উত্তরপ্রান্তে গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। সবাই হাঁপাচ্ছে। সবার চোখে-মুখে আতঙ্ক। এখানে বসে আমাদের গ্রাম হালকাভাবে দেখা যায়। এখান থেকে ডেমরার আগুনের ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভয় যেন পিছু ছাড়ছে না। অনেকেই বলছে দয়ারামপুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরেই সাঁথিয়া থানা সদর। সেখানেও পাকিস্তানিদের একটি ঘাঁটি রয়েছে। এখানে মানুষের আশ্রয় নেওয়ার কথা জেনে আক্রমণ করলে বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু এই বিপদে এর চেয়ে ভালো আশ্রয় আর পাওয়া যাবে না। তাই সবাই এখানেই বসে রইলাম।

ডেমরা গ্রামের ৮০ ভাগ বাসিন্দাই হিন্দু। পাবনার ফরিদপুর উপজেলার সমৃদ্ধ একটি গ্রাম। এখানে বড়ো একটি বাজার, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, তহশিল অফিসসহ নানা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গ্রামটি অগ্রগামী। এ গ্রামের হিন্দুরা বেশ সম্পদশালী। ঘি, ছানা, মিষ্টি, মাটির পাতিল ইত্যাদির জন্য গ্রামটি খুবই প্রসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এলাকার ব্যাবসা চলে এ বাজারকে কেন্দ্র করে। এ গ্রামে পূজা-পার্বণ লেগেই থাকে। বড়ো বড়ো পূজার সময় বসে কয়েক দিনব্যাপী মেলা। মেলায় দূর গ্রাম থেকেও অনেকে কেনাকাটা করতে আসে। গ্রামের উত্তর-পূর্বদিকে পদ্মার প্রথম শাখা বড়াল নদী, পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বিশাল কৃষিজমি, দক্ষিণের কিছু অংশজুড়ে রূপসী-বাউশগাড়ি, পশ্চিম দিকে কৃষিজমি। শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেও আশপাশের গ্রামের তুলনায় ডেমরা বেশ এগিয়ে।

পাকিস্তানি বাহিনী আগে যেদিন আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে সেদিন কষ্ট করে হেঁটে আশ্রয় নিয়েছিলাম দিঘুলিয়া গ্রামে, বড়ো বোনের শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে বেশ কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম। মনে আছে, বোনের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পর আগে আমাদের খেতে দিয়েছিল। কিন্তু আজ আশ্রয় নিয়েছি গ্রামের গাছের ছায়ায়। এ গ্রামে আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। আমাদের পাশেই রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। তার সামনে বড়ো একটি খেলার মাঠ। মাঠের এক পাশে একটি টিউবওয়েল। সেই টিউবওয়েলের পানিতে ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করলাম। সবাই এখানে বসে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখছে বিষণ্ন মনে। বাড়ি থেকে পালানোর সময় মা যে সিদ্ধ আলু খাইয়েছেন, তারপর পেটে আর দানাপানি পড়েনি। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই মা সব সময় মিষ্টি আলু সিদ্ধ করে রাখেন, যাতে এমন বিপদের সময় খাওয়া যায়। ক্ষুধায় পেট চোঁ-চোঁ করছে। চার ভাইয়ের মধ্যে বড়ো ভাই দশম শ্রেণি, মেজো ভাই পঞ্চম আর আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। ছোটো ভাই স্কুলে যাওয়া-আসা করে। মা ছটফট করছেন, আমরা কিছু খাইনি বলে। নিজের ক্ষুধা নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই।

এ গ্রামের অনেকেই ভিড় করেছে এখানে। আমাদের কাছে নানা কথা জানতে চাচ্ছে। কখন খবর পেলাম, কীভাবে খবর পেলাম, কীভাবে পালালাম, কখন পাকিস্তানিরা আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে গেছে– ইত্যাদি নানান প্রশ্ন। এদিকে দুপুর হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের খাওয়ার কথা কেউ বলছে না। এ গ্রামের অনেকেই বাবাকে চিনে। বাবা ছিলেন আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁকে সবাই সম্মান করে কিন্তু খাওয়ার বিষয়ে কিছুই বলছে না। গ্রামের নাম দয়ারামপুর হলেও মানুষের মধ্যে দয়া আছে বলে মনে হচ্ছে না। মা অস্থির হয়ে পড়েছেন আমাদের খাওয়ার কথা ভেবে। আত্মীয়তার সূত্র মা খুব মনে রাখতে পারতেন। সেই সূত্রে এখানে একজন আত্মীয় খুঁজে পেলেন এ গ্রামের আগন্তুকদের মধ্যে। কথাবার্তার ফাঁকে আমাদের খাবারের জন্য তাকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কোনো কিছু না বলেই সরে পড়লেন তিনি। মায়ের মুখটা বিষণ্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের নিয়ে একজনের বাড়িতে রওনা হলেন। এক বৃদ্ধা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িটিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, দরিদ্র একটি পরিবার। ঘরের চাল ছনের ছাউনি এবং বেড়া পাটকাঠির। ঘরের বারান্দায় আমরা বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার এল। ভাত, আলু আর বেগুন ভর্তা, সঙ্গে মশুরের ডাল। ভাত দেখে যেন ক্ষুধা আরো বেড়ে গেল। মা চোখের ইশারা দিলেন– যেন এটুকু ভাতই সবাই মিলে খাই। তৃপ্তি সহকারে খেলাম, যেন এত ভালো রান্না কোনোদিন খাইনি। পরে জানতে পারলাম এই পরিবারটিও আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আগে যার সঙ্গে মা কথা বলেছিলেন, তারা সচ্ছল পরিবার, কিন্তু আমাদের খাবার দিলেন না।

বিকেল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যা নেমে আসবে। পাকিস্তানিরা চলে গেছে কি-না কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। অনেকক্ষণ ধরে আগুনের কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে না। একজন এসে জানাল যে, পাকিস্তানিরা চলে গেছে। আমাদের গ্রামের ওপর দিয়েই বাঘাবাড়ি ফিরে গেছে। বলছে, পুরো ডেমরা গ্রাম আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করেছে। পাশের রূপসী-বাউশগাড়ি গ্রামও ছাড়খার করেছে। শত শত মানুষকে সারিবদ্ধ করে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে। অনেককে নদীর পাড়ে গুলি করে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে। যারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছে, তাদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে। কে হিন্দু, কে মুসলমান তার কোনো বাছবিচার করেনি। কোনো মানুষ বেঁচে আছে কি না সন্দেহ।

হঠাৎই সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এখন পথ চলা সম্ভব নয়। তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বৃষ্টি কিছুটা কমল। এখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। রাত অনেক হয়ে গেছে, তাই ভিজেই রওনা হলাম। মাঠ কাদা হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনো টর্চলাইটও নেই। অনুমানের ওপর পথ চলতে হচ্ছে। গ্রামের মানুষের এমন অন্ধকারে পথ চলার অভ্যাস আছে। আমরা বড়োদের অনুসরণ করে চলছি। খুবই পিচ্ছিল পথ। পায়ের পাতায় কীসের যেন খোঁচা লাগছে। মনে হচ্ছে কাঁটা ফুটছে। সবার হাতেই পোটলা, তাই কোলে বা কাঁধে ওঠার সুযোগ নেই। মা ও ফুফু বয়সেও প্রৌঢ়। তারা দুপুরে কিছুই খান নাই। কয়েকবার আছাড় খেলাম। সোহরাব (হাউলা) ভাইয়ের মাথায় বড়ো একটি বাক্স। সেও পারছে না আমাদের

কাঁধে বা কোলে নিতে। ছোটো ভাই কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, আর হাঁটতে পারছি না। এরপর মরে গেলেও বাড়ি থেকে পালাবো না। কথাটা শুনে সোহরাব ভাইয়ের খুব মায়া হলো। সে বাক্স মাথায় নিয়েই ছোটো ভাইকে কোলে তুলে নিল। এভাবে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে রাত এগারোটার দিকে বাড়ি ফিরলাম।

ছোটোবেলায় ঘুম থেকে উঠেই নদীর পাড়ে যেতাম। কী ভয়ানক কথা! কেউ নদীতে নামছে না। একের পর এক লাশ ভেসে যাচ্ছে। ডেমরা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বড়াল নদী আঁকাবাঁকা পথ চলে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলছে। এই নদীর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সংযোগ, আমার হৃদস্পন্দন, এই নদী আমার ছোটোবেলার খেলার সাথি। দিনের অনেকটা সময় কাটত নদীতে সাঁতার কেটে, গোসল করে। দীর্ঘ সময় নদীতে গোসল করার জন্য অনেক দিন বাবার বকুনি খেয়েছি, পিটুনিও খেয়েছি অনেক বার। তবুও নদীর পানিতে সাঁতার কাটা বা খেলা করা বন্ধ হয়নি। ডেমরা হত্যাকাণ্ডের পরদিন থেকে সেই নদীতে আমাদের গোসল বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের মহিলারা তাদের রান্নাবান্নার কাজ করত নদীর পানি দিয়ে। কলসিতে করে নদী থেকে পানি নিয়ে সংসারের কাজকর্ম করত। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিদিনই মানুষের মৃতদেহ ভেসে আসে, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মাস খানেক আমরা নদীতে গোসল করিনি। কোনো কাজেই কেউ নদীর পানি ব্যবহার করেনি। এমনকি বন্ধ হয়ে গেল এ নদীর মাছ খাওয়া।

দিনটি ছিল শুক্রবার। মুসলমানদের অনেকেই ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখনো মসজিদে আজান দেয়নি। ডেমরা ও সাঁথিয়ার রূপসী-বাউশগাড়ি গ্রামের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনী। গ্রাম দুটি পাশাপাশি লাগোয়া। হঠাৎই গর্জে ওঠে আধুনিক মারণাস্ত্র। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন, সঙ্গে গুলি আর ভারী বুটের খটমট শব্দ, বিচ্ছিরি ভাষায় গালিগালাজ। সবাই বুঝতে পারে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছে। ঘুম থেকে উঠে এমন আতঙ্কের ভেতর কি কিছু চিন্তা করা যায়? ঘরে থাকলেও তো আগুনে পুড়তে হবে। তাই তীব্র আর্তচিৎকার আর আর্তনাদ করে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু হয়। গুলির বিকট শব্দ আর আগুনের লেলিহান শিখায় সবাই দিশেহারা। হানাদার বাহিনী বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে পুরুষদের নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়। নারীদের ধরে বাবা, মা অথবা স্বামীর সামনেই চালায় নির্বিচারে ধর্ষণ। অনেকেই জীবন বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেয়, সেখানেই চালায় গুলি। যারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে তাদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়। বাউশগাড়িতে আশ্রয় নেওয়া দুই ভাইকে গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। অনেককে কুয়ার মধ্যে ফেলে সেখানেই চালানো হয় গুলি। হানাদার বাহিনী আর সঙ্গে থাকা রাজাকাররা চালায় লুটতরাজ। অসংখ্য নারী তাদের সম্ভ্রম হারান। গ্রামের প্রায় সব বাড়ি, বাজার, দোকানপাট জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে হানাদার বাহিনী। এ নারকীয় গণহত্যায় বাউশগাড়ি গ্রামের সাড়ে তিনশ মানুষসহ সহস্রাধিক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়।

মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের ভেতরে কোথাও নিরাপদ ছিল না। তবুও যারা দেশ ত্যাগ করেনি তারা দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়িয়েছেন দেশের ভেতরেই। আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটেছেন এখান থেকে সেখানে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। এমন পরিস্থিতির শিকার আমরাও ছিলাম। শহর বা উপজেলার সদরে যারা বসবাস করতেন তাদের অধিকাংশই নিভৃত গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ডেমরা গণহত্যার দিনে আশ্রয় নেওয়া অনেকেই এখানে প্রাণ হারান। পাবনা, বেড়া, শাহজাদপুর, কুচিয়ামারা, নগরবাড়িসহ বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ ডেমরা ও রূপসী-বাউশগাড়ি গ্রামসহ আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়। ডেমরা গ্রামে আশ্রিতদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং ধনী ব্যবসায়ী। স্থানীয় রাজাকাররা এই আশ্রিতসহ এলাকার হিন্দুদের সম্পদ লুট করতে পরিকল্পনা আটে। ১০ই মে মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে রাজাকাররা এক বৈঠক করে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় ডেমরা-বাউশগাড়িতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নিয়ে যাওয়ার। এই কাজে অন্যতম দোসর ছিল আসাদ রাজাকার। ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে এই বর্বরোচিত হামলা ও হত্যাকাণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শী ওয়াজেদ আলীর মতে– এদিন মাখন লাল রায়, বলরাম রায়, বিভুতি ভূষণ কুণ্ডু, বীর ভদ্র কুণ্ডু, শুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সতিন্দ্র নাথ ঘোষ, ঋষিকেশ কুণ্ডু, স্বপন কুণ্ডু, সুশান্ত ঘোষ, মাহমুদ আলী, দুলাল কর্মকার, অনাথ বন্ধু, জগদীশ কুণ্ডু, সতিশ চন্দ্র কুণ্ডু, নীল মনি পাল, মংলা কুণ্ডু, বিরেন্দ্রনাথ পাল, জামিনী মোহন পালসহ সহস্রাধিক লোককে হত্যা করা হয়। অধিকাংশ মানুষকে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৮ বছর পর ডেমরা গণহত্যার বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের হয়। এই গণহত্যার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে জামায়াত ইসলামের আমির মওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে দায়ী করা হয়। অভিযোগ তদন্ত করতে ১১ সদস্যের একটি দল ২০১০ সালে ডেমরা-বাউশগাড়ি পরিদর্শন করেন। তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীসহ অনেকের সাক্ষাৎকার নেন। তদন্ত দলের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাইব্যুনালের অন্যতম প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান। তদন্ত দল ঘটনার সত্যতা পায়। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ট্রাইব্যুনাল মওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। অবশেষে ২০১৬ সালের ১১ই মে জামায়াত ইসলামের আমীর মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির রায় কার্যকর হয়। নিজামী ডেমরা গ্রামে পাকিস্তানিদের পাঠানোর জন্য রাজাকারদের নিয়ে বৈঠক করে ১৯৭১ সালের ১০ই মে। ঠিক ৪৫ বছর পূর্ণ হওয়ার দিন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।

শিশুকালের সেই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি আজও। ডেমরা গ্রামের উচ্চবিদ্যালয়ে আমি পড়াশুনা করেছি। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে গিয়েছি আর খুঁজে ফিরেছি কোথায়, কাকে, কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যাঁরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদেরকে আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। তবে আজ এটুকুই স্বস্তি যে, এই নারকীয় জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিচার হয়েছে।

লেখক: মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

অভাজনের কবি কাজী নজরুল

অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে বাংলাকাব্যকে শাসন করছেন, নিত্য নতুন সৃজনে ও পরিবেশনার অভিনব শৈলীতে প্রোজ্জ্বল করে রেখেছেন তখন ধূমকেতুর মতো অকস্মাৎ রণভেরী বাজিয়ে বাংলাকাব্য প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। দারিদ্র্যপীড়িত কবি সীমাহীন স্বপ্নকে সঙ্গী করে অর্ণব যাত্রায় সক্রিয় হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের উর্দি খুলে উর্দু ফেলে বাংলায় উপাবর্তন করলেন। শুরু হলো অভাজনের শ্রান্তরহিত কাব্যচর্চা। পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হলো– *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশী*, *ভাঙার গান*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণীমনসা*, *প্রলয় শিখা*, *ব্যথার দান*, *রিক্তের বেদন*, *মৃত্যুক্ষুধা*, *রুদ্র মঙ্গল*সহ বিভিন্ন গ্রন্থ ও অজস্র গান।

কাজী নজরুল ইসলামের এসব গ্রন্থ ও গানে বহুবিচিত্র বিষয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অন্তরঙ্গ আলোকে কবির পর্যবেক্ষণ, বিশ্বাস ও স্বপ্ন সংলগ্ন হয়েছে। এগুলো হয়েছিল কবির মানস নির্মিতির প্রেক্ষিতে। কবির মানস নির্মাণে ভূমিকা রেখেছিল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতা, শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অত্যাচারিত বিবর্ণ দশা, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, মোস্তফা কামাল পাশার আধুনিক তুরস্কের ভিত্তি স্থাপন, স্বদেশি আন্দোলন, কমরেড মুজাফফর আহমেদের নিবিড় সান্নিধ্য ইত্যাদি। ফলে কবি প্রণয়, অনুরাগ, বিরাগের সঙ্গে আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপ্লবকে সহযাত্রী করলেন তাঁর সাহিত্যে। দৃপ্ত স্বরে ঘোষণা করলেন সর্বাত্মক বিদ্রোহ। তবে প্রণয়-প্রীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। কবি প্রারম্ভেই বললেন–

> মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।

এই যুদ্ধ শিঙা বা রণতূর্য বাজিয়েছেন তিনি আমৃত্যু, সংশপ্তকের মতো বলেছেন–

> আমি ভয় করি কি হরি?

কবি নির্ভয়ে যে রণতূর্য বাজিয়েছেন, তা বাজিয়েছেন শোষক, শাসক, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, শঠতা, প্রতারণাসহ সকল অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে। সঙ্গতকারণে তিনি সাম্যবাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন শ্রমজীবী শ্রমিক, কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলেসহ প্রান্তবর্তী জনগণের পক্ষে। সামাজিক বাস্তবতায় এরা ছিল নিষ্প্রভ, ম্লান, জড়বৎ ও নিস্তেজ। কবি এই অনাশ্রয়ীদের চিত্তজাগরণে, দ্রোহে ও উজ্জীবনে লিখলেন–

> রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত ইটে,
> ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
> দিব্যি পেতেছ খল-কলওয়ালা মানুষ পেষানো কল,
> আখপেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।

কবির অন্তরে শোষক শ্রেণির প্রতি যে বহ্নিজ্বালা, যে ক্রোধ ও ক্ষোভ ছিল তা তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি তাই বলেন–

> (আজ) চারিদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত।
> (ও ভাই) জোঁকের মতন শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত।
> (মোর) বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইকো আমার হাত।
> (আজ) সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল।

উল্লেখ্য, কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন কাব্যচর্চায় সার্বক্ষণিক আত্মনিবেদিত হয়ে উঠেছেন তখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না বলে তিনি অপরাপর সহযোগীদের নিয়ে ১৯২৫ সালে গড়ে তুলেছেন 'মজুর স্বরাজ পার্টি'। একদিকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, বিত্তবান, সম্পদশালী, সামন্ত ও বেনিয়াদের অর্থাৎ অভিজনের দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও মজুর স্বরাজ পার্টি কৃষক, শ্রমিক, ব্রাত্য, প্রান্তজন অর্থাৎ অভাজনের দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি সরাসরি মজুর স্বরাজ পার্টিতে যুক্ত থেকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে প্রাণিত হয়ে অভাজনপ্রেমী কবি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে বলেছেন–

> ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন
> বেলা বয়ে যায় খায়নিকো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম কতখানি অভাজনপ্রেমী ছিলেন তা তাঁর অসংখ্য কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে– কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, কুলি-মজুর, চোর-ডাকাত, চরকার গান, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, বীরাঙ্গনা, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য, সর্বহারা, ধীবরের গান, মুক্তিকামী, জীবন বন্দনা ইত্যাদি।

কবির অভাজন প্রেম দৈশিক সীমা অতিক্রম করে বৈশ্বিক স্তর স্পর্শ করেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়–

> বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন ভুঁড়ি
> নিরন্নদের ভিটে নাম করে জমিদার চড়ে জুড়ি।
> পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
> নিচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয়।

এক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের সাম্যবাদ তত্ত্বে যেভাবে পুঁজিবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কবি সে ব্যাখ্যাকে স্বীকার করেই অভাজন প্রেম ব্যক্ত করেছেন। যদিও মার্কসের Proletariat Have nots-এর দার্শনিক পূর্বশর্ত কবি পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিলেন না। তবুও সামগ্রিক বিচারে বাংলাকাব্যে অভাজনপ্রেমী হিসেবে তিনি প্রথম ও অদ্বিতীয়। কারণ তাঁর মতো করে শ্রমজীবীর শ্রমবারি আর কেউ প্রত্যক্ষও করেননি ও প্রকাশও করেননি।

অভাজনপ্রেমী কাজী নজরুল ইসলাম কার্ল মার্কসের মতো নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমিককে খাটিয়ে নিয়ে মুনাফা অর্জনের ষড়যন্ত্রকে সংক্ষোভ ও ঘৃণায় উচ্চারণ করেছেন।

বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল।

এই যে অভিজনদের দ্বারা অভাজনদের শোষণ, শাসন ও পীড়ন– তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাঘাত করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এক্ষেত্রে তিনি আপোশহীন, বিদ্রোহী, নির্ভীক, সংগ্রামী এবং সাহসী সৈনিক। তাঁর দ্বিধাহীন উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে *ধূমকেতুর* পাতায় পাতায় এবং অপরাপর সাহিত্যে। যেমন কবি বলেছেন– '.... রেল, স্টিমার, বিদ্যুৎগাড়ি, কলকারখানা, একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এ নিমিত্ত বায়ু, বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মানুষ, পশুপক্ষী, অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহবা সমাজ, শান্তি, শৃঙ্খলার নামে কোটি কাটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগিল। লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থানের সর্বনাশ করিয়া চারি পাঁচ শত লোক ধনী হইলেন এবং বিলাসব্যসনে অর্থ ব্যয় করিলেন।'

অভাজনদের মুক্তি বাসনায়, সাম্য-সমতা প্রত্যাশায় এবং শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এমন দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ বাংলা সাহিত্যে নজরুল পূর্বকালে আর কোনো কবি উচ্চারণ করেননি। এমন মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি আর কোনো সাহিত্যিক ঘোষণা করেননি। উল্লেখ্য, *অগ্নিবীণা* কাব্য থেকেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম অভাজনদের মুক্তি কামনায় ব্যাকুল হয়েছেন। *নবযুগ*, *ধূমকেতু*, *মোসলেম*, *ভারত* প্রভৃতি পত্রিকায় অভাজনপ্রীতি মুগ্ধতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। *ধূমকেতুর* বিপ্লবী সঙ্গী কমরেড মুজাফফর আহমদের সাহচার্য-সান্নিধ্য তাঁর অভাজন প্রণয়কে শাণিত করেছে। ফলে কবি নিঃশঙ্কচিত্তে সত্যাশ্রয়ী হয়ে বলতে পারেন– '...মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব– অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে। এ অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সংগীতে, কর্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।'

আর এ কারণে সমগ্রভাবে সদ্বিচারে এবং উত্তম নির্ধারণে কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতই অভাজনের কবি। তিনি অভাজনের কবি হিসেবে বাংলাসাহিত্যে আদি, অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয়।

লেখক: সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)

দেশের সবচেয়ে বড়ো কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল

রাজধানীর মহাখালীতে ১৮ই এপ্রিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মার্কেটে দেশের সবচেয়ে বড়ো এক হাজার শয্যার কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক। এসময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মেয়র আতিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, গোটা বিশ্বের ন্যায় কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের দেশেও হানা দিয়েছে। কোভিডে আক্রান্ত ও মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন ভীতিকর হচ্ছে। প্রতিদিনই আইসিইউ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম একটি কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জরুরি ভিত্তিতে ডিএনসিসি'র এই মার্কেটটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে উদ্‌বোধন করা হয়। এই হাসপাতালে কোভিড রোগীদের জন্য মোট বেড সংখ্যা রয়েছে এক হাজার। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ বেড ২১২টি, এইচডিইউ বেড ২৫০টি, কোভিড আইসোলেটেড রুম আছে ৪৩৮টি। এখানে ইমার্জেন্সি বেড ৫০টি, যার ৩০টি পুরুষ ও ২০টি মহিলা রোগীর জন্য। এর পাশাপাশি এখানে আরটি পিসিআর ল্যাব, প্যাথলজি ল্যাব, রেডিও থেরাপি সেন্টার, এক্সরে সুবিধাসহ অন্যান্য নানাবিধ সুবিধাদি রয়েছে।

বর্তমানে হাসপাতালটির ২৬০টি বেড সচল হচ্ছে। যেখানে আইসিইউ বেড রয়েছে ৬০টি, ইমার্জেন্সি ৫০টি, জেনারেল ওয়ার্ড ১৫০টি। এ মাসের মধ্যে হাসপাতালটি পরিপূর্ণভাবে সচল হবে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

দেশের প্রতিটি হাসপাতালে কোভিড ডেডিকেটেড বেড সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেন্ট্রাল অক্সিজেন সুবিধাদি বৃদ্ধি করার বিষয়টি তুলে ধরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বর্তমানে দেশে প্রায় ১০০টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আরো ৩৪টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালুর কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে বর্তমানে দেশে প্রায় ১২ হাজার বেডে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এসব সুবিধা নিশ্চয়ই দেশের কোভিড রোগীদের জীবন রক্ষায় বড়ো ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: সৃজা রানি

মা কথাটি ছোট্ট অতি, কিন্তু...

নাসরীন মুস্তাফা

কবি কাজী কাদের নেওয়াজের লেখা বিখ্যাত 'মা' কবিতাটি কত বার শুনেছি!

মা কথাটি ছোট্ট অতি,
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নামটি মধুর
তিন ভুবনে নাই।

আসলেই। ছোট্ট 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে সবার মন নরম হয়ে আসে। যার মা আছেন আর যার মা নেই, সবাই কী এক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়, যার বর্ণনা দেওয়ার মতো ভাষা যার মা আছেন তিনিও দিতে পারেন না, যার মা নেই, তিনিও দিতে পারেন না। যা কিছু সুন্দর, তার প্রতিশব্দ মা। ঐ কবিতার পরের কথাগুলো তাই এরকম–

সত্য ন্যায়ের ধর্ম থাকুক
মাথার পরে আজি
অন্তরে মা থাকুক মম
ঝরুক স্নেহরাজি।

মা সব সময় সন্তানের জন্য সত্য ন্যায়ের ধর্ম মেনে চলেন। মা আসলে জাগতিক ধর্মগুলোর অনুসরণ করেও আরো বেশি ধার্মিক। সন্তানের কল্যাণ ছাড়া তার প্রার্থনায় আর কিছু নেই। সন্তানও গ্যারান্টেড সার্টিফিকেটের মতো জানে, মা কাছে থাকুন আর না থাকুন, মায়ের কল্যাণ কামনা তার সাথে আছে।

রোগ-বিছানায় শুয়ে শুয়ে
যন্ত্রণাতে মরি
সান্ত্বনা পাই মায়ের মধু
নামটি হৃদে স্মরি।
বিদেশ গেলে ঐ মধু নাম
জপ করি অন্তরে,
মন যে কেমন করে আমার
প্রাণ যে কেমন করে।

এই প্রিয় কবিতার বাকি অংশটুকু–

মা যে আমায় ঘুম পাড়াত
দোলনা ঠেলে ঠেলে,
শীতল হতো প্রাণটা মায়ের
হাতটা বুকে পেলে।
মাগো, আমি বিদেশ থেকে
দিচ্ছি তোমায় চিঠি,
কেমন আছ জানতে চাহি,
দেখতে চাহি দিঠি।
তোমায় স্মরি চোখ ফেটে মোর
অশ্রু যে আজ ঝরে,
প্রাণ যে কেমন করে আমার
মন যে কেমন করে।

এই কবিতায় পেয়েছিলাম 'দিঠি' শব্দটি। মিষ্টি এই বাংলা শব্দ এখন হারিয়ে গেছে অনুচ্চারণের পাল্লায় পড়ে। ছোটোবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল, নাম তার দিঠি। তখন জেনেছিলাম, দিঠি মানে দৃষ্টি। কবিতায় দিঠি শব্দটি ব্যবহার করে কবি বলতে চেয়েছিলেন, মা কেমন আছেন, তা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করে তার।

দিঠি নামের আমার সেই বন্ধুর কথায় আসি। আমরা যখন সবে মাত্র পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পা দেব, ঐ বয়সটাতে দিঠি ওর মা'কে হারিয়ে ফেলে। দুদিনের জ্বরে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দিঠির মা জ্ঞান হারালেন। সেই জ্ঞান আর ফেরেনি। দিঠি আমার খেলার সাথি। একই পাড়ায় থাকি আমরা। মা হারানো দিঠিকে দেখলেই আমার আম্মার চোখ ভিজে যেত। দিঠির সামনে কখনোই আমাদেরকে স্নেহমাখা সুরে আম্মা কিছু বলতেন না। দিঠি কষ্ট পাবে বলে। দিঠির মাথার চুলে তেল দিয়ে দিতেন আম্মা, কেননা ওর ঘন কালো চুলের রাশি মা হারানোর পর থেকে অযত্নে রুক্ষ হয়ে পড়ছিল। কিছু দিন পর দিঠিরা চলে যায় অন্য কোথাও। ওর সাথে আর দেখা হয়নি। বহু বছর পর আমরা যখন কলেজে পড়ছি, তখন আবার দিঠিকে পেয়েছিলাম কলেজে। জেনেছিলাম, মা হারানো দিঠিকে সবাই যে আদরটুকু করছিল, তাতে ওর বাবার নাকি মনে হতো, দিঠি সহজভাবে বড়ো হতে পারবে না। দিঠির বাবা ওকে নিয়ে দূরে চলে যান। নতুনভাবে জীবন শুরু হয় ওদের। বাবা আর দিঠি, দিঠি আর বাবা। একা হাতে দিঠিকে মানুষ করেছেন ওর বাবা।

দিঠি আমাদেরকে বলেছিল, বাবাই আমার মা। আসলেই তো! মায়ের মতো ভালোবাসতে হলে কেবল গর্ভধারিণী মা হতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই।

মা একজন মানুষ, সন্তানও একজন মানুষ। মাতৃত্বের বাইরেও মায়ের মানুষ হিসেবে অনেক কিছু চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে। কেবলমাত্র মায়ের আদলে থাকা নারী বয়সকালে এসে টের পান, নিজের যত্ন নেননি বলে শরীরটা আর ঠিক থাকছে না।

করোনা অতিমারির সময়ে এই সত্য আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখতে বাধ্য হলাম। ঘরবন্দি মা আর সন্তান। করোনাভাইরাসে বয়সি মানুষ মরছেন। মা মরছেন। মায়ের সন্তান কিছু বুঝে ওঠার আগেই মা'কে হারাচ্ছে, বাবাকে হারাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে পরিবার। স্বামীহারা মা নিজেকে চরম অসহায় অবস্থায় খুঁজে পাচ্ছেন যখন, তখন তার লড়াইয়ের হাতিয়ার নেই। নিজের

অর্থনৈতিক সক্ষমতা নেই, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ কীভাবে জোগাবেন জানেন না, খেয়েপরে বেঁচে থাকার অবলম্বনইবা কোথায়। বেঁচে থাকার লড়াই চলছে এখন। যতদিন যাবে, এই লড়াই আরো প্রকট হয়ে উঠবে। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ানো মা বুঝতে পারছেন, সন্তানকে বাঁচতে শেখানোই আসলে আসল কাজ। জিপিএ ফাইভের চাইতে বেঁচে থাকা অনেক বেশি জরুরি।

পথশিশুরা এরকম বাস্তবতা টের পায় বলেই পথে নামে জীবিকার তাগিদে। করোনা অতিমারি ওদের জীবিকাও কেড়ে নিচ্ছে। এ রকম সময়ে দরকার পড়ছে মাতৃত্বের। সত্যিকারের মা তিনিই, যিনি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নিজ-পর নির্বিশেষে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারছেন। সেই মা গর্ভধারিণী হবেন, এমন কোনো কথা নেই। সেই মা নারীই হবেন, এমনও কোনো কথা নেই। আসলেই তাই। সদ্য কিশোর একদল বন্ধু এক টাকায় ঈদের বাজার দিচ্ছিলেন জীবিকা হারানো অসহায় মানুষদের। এদের মনে মানুষের জন্য যে মায়া জন্মেছে, তা আসলে মায়ের মনে জন্ম নেওয়া মায়ার অনুরূপ।

বিখ্যাত লেখক কমলা ভাসিন লিখেছিলেন, মাতৃত্ব আসলে একটি বোধ। এই বোধ যার আছে, তিনিই মা। কমলা ভাসিন এও বলেছেন, পিতৃত্বও একটি বোধ। এই বোধ যার আছে, তিনিই পিতা। জন্মদাতা পিতা দায়িত্ব অস্বীকার করে সন্তানকে ফেলে চলে গেলে পিতৃত্বের বোধ থেকে মা সন্তানের পিতার ভূমিকা গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করেন। মা তখন হয়ে ওঠেন পিতা। কেবল সন্তান জন্মদানেই পিতা কিংবা মাতা হওয়া যায় না, এটাই হচ্ছে মূলকথা।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী মা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই মা দিবস পালনেরও ইতিহাস আছে দীর্ঘ। প্রাচীন গ্রিসে মায়ের আরাধনার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনেকে বলেন। গ্রিক দেবী সিবেলের কাছে অর্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে মায়ের আরাধনা করা হতো। রোমে ১৫ই মার্চ থেকে ১৮ই মার্চের মধ্যে আইডিস অব মার্চ নামে একটি উৎসব হতো মায়ের জন্যই। প্রাচীন রোমানরা দেবী জুনোর প্রতি উৎসর্গ করে একটি ছুটির দিন বানিয়েছিল, যে দিন মায়েদের উপহার দেওয়া হতো। ইউরোপে মাদারিং সানডে ছিল বলে শুনেছি। একটি নির্দিষ্ট রবিবারকে আলাদা করে রাখা হতো মাতৃত্বকে সম্মান জানানোর জন্য। এই দিনে মা'কে উপহার দেওয়া, মায়ের তথা মেয়েদের প্রতিদিন করতে হয়– রান্না, ধোঁয়া-মোছার মতো ঘরের যেসব কাজ, তা বাড়ির অন্যরা করে দেওয়ার চর্চা ছিল। ১৮৭০ সালে জুলিয়া ওয়ার্ড হোই লিখলেন 'মাদার্স ডে প্রক্লামেশন' বা 'মা দিবসের ঘোষণাপত্র'। সমাজকে গড়ে তুলতে নারী দায়িত্ব পালন করেন, এই বোধকে বিশ্বাসে পরিণত করাই ছিল এই ঘোষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য।

১৯১২ সালে আনা মারিয়া রিভস জার্ভিস গড়ে তোলেন 'মাদারস ডে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন' বা আন্তর্জাতিক মা দিবস সমিতি। আনা মারিয়া রিভস জার্ভিস এই কাজে কেন নামলেন, তার পেছনে একটি ঘটনা আছে। মা অ্যান মারিয়া রিভস জার্ভিস ছিলেন শান্তিকামী একজন মানুষ। সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। 'মাদারস ডে ওয়ার্ক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মা। ১৯০৫ সালে তাঁর মৃত্যু হলে মেয়ে আনা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে মায়ের অসমাপ্ত কাজ করতে শুরু করেন। সব মা'কে শ্রদ্ধা জানাতে একটি দিবস হলে মন্দ হয় না, এই চিন্তা তখন তাঁর মাথায় এল। তাঁর গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক মা দিবস সমিতির প্রচেষ্টায় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস হিসেবে পালিত হওয়ার রীতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে মা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবেও ঘোষণা করা হয়। ক্রমশ প্রতিটি পরিবার মা'কে সম্মান করুক, এই আহ্বান ছড়িয়ে যায় বিশ্বময়।

মা দিবসে আমি সন্তান হিসেবে আমার মায়ের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করি। আমার সন্তান আমাকে ভালোবাসা জানায়। চমৎকার একটি দিন। অন্য সব দিনের ক্লান্তি মুছে যায় এই দিনে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে আমরা সবার টাইমলাইনে যার যার গর্ভধারিণী মায়ের ছবি দেখতে পাই। নিজের মা'কে নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা লেখেন সবাই। 'মা কথাটি ছোট্ট অতি' এই কবিতার পঙ্‌ক্তিও চোখে পড়ে।

মা দিবস মায়ের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করুক। মায়ের জন্য তুষ্টিকর আবেগমাখা কথা শুনতে ভালো লাগে। আবার পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, সব মা তার নিজের জীবন নিয়ে তো বটেই, নিজের সন্তানের জন্যও নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। মা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এই বিশ্বাস বাস করুক সব সন্তানের অন্তরে। সন্তানের প্রতিটি দিন যেমন মায়ের যত্নে সুন্দর থাকে, তেমনি প্রতিটি দিনই হয়ে উঠুক মায়ের সম্মান অর্জনের দিবস।

করোনা অতিমারির সময় আমরা টের পেয়েছি, বাংলাদেশকে, দেশের মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ঠিক যেমনি মা লড়াই করেন সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চিকিৎসক-বিজ্ঞানী-স্বাস্থ্যকর্মী-প্রশাসনের নানা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-বেসরকারি নানা শ্রেণি-পেশার নানা বয়সের অনেক মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। মমতার আধার এই মানুষগুলোকেও জানাতে চাই মা দিবসের শ্রদ্ধা। মাতৃত্ববোধের জয় হোক।

লেখক: বিসিএস (তথ্য সাধারণ) ক্যাডারের সদস্য, প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

নজরুল কাব্যে ঈদুল ফিতর

জাফরুল আহসান

দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর পশ্চিমাকাশের বাঁকা এক ফালি চাঁদ মুসলমানদের দরজায় কড়া নাড়ে; আসছে ঈদুল ফিতর। ঘরে ঘরে মনেপ্রাণে উচ্চারিত হয় 'ঈদ মোবারক'। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এবং রেডিও স্টেশনগুলোতে গীত হয় কাজী নজরুল ইসলামের আকাশচুম্বী জনপ্রিয় সংগীত।

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানী তাকিদ।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো, তাঁর বিশাল রচনাবলির বেশ খানিকটা অংশ জায়গা দখল করে নিয়েছে ইসলামিক গান ও গজল। নজরুলের কাব্যে বরাবরই ঈদ চিত্রিত হয়েছে নানা মাত্রিকতায়। নজরুলের গান ও কবিতার মূলবাণী হচ্ছে পরম করুণাময়ের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। ব্যক্তি ও সমষ্টির সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তাঁর কণ্ঠে। ঈদুল ফিতরের উৎসবের মধ্যে তিনি ধনী-গরিবের ভেদাভেদ দূর করতে চেয়েছেন। উৎসবের সমান অংশীদার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। স্বভাবতই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়–

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশমন
হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল
ইসলামে মুরিদ।

ঈদের দিন মসজিদ কিংবা ঈদগাহে ঈদের নামাজ শেষে পরস্পর সৌহার্দ্য বিনিময়ের মাধ্যমে শুরু হয় ঈদের আনুষ্ঠানিকতা। কেবলি বাঁধভাঙা আনন্দ, জোয়ারের উচ্চতা এসবের মাঝেও কবি চিত্ত কেঁদে ওঠে। অধিকার আদায়ে সোচ্চার কবিকণ্ঠ। এখানে কোনো ক্রোধ কিংবা হিংসা নেই। বিত্তবানদের বিশাল ধনভাণ্ডার থেকে সামান্য জাকাত দেওয়া।

জাকাত দেওয়া অর্থাৎ গরিবের প্রতি কোনো প্রকার অনুকম্পা নয়। এ যে ইসলামের নির্দেশ। গরিবের অধিকার গরিবদুখি মানুষের অংশীদারিত্বের কথা, মানবতার কথা, তথা সমবণ্টনের কথা বারবার নজরুল কাব্যে শ্রীবৃদ্ধি করে এসেছে। যেমন–

অ) মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন-রত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তার হুকুম
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব, এই জুলুম?

সমাজের কেউ ঈদ আনন্দে উদ্বেলিত হবেন আর অন্যজন আনন্দবঞ্চিত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে, এ জাতীয় বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ দেখি নজরুলের কবিতা ও গানে–

আ) সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা-মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা
মোদের হিসসা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লাহতালা
দ্বার খোল সাততলা বাড়িওয়ালা দেখ কারা দান চাহে
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দিব ঈদগাহে।

সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ যদি নিম্ন শ্রেণির মানুষের পাশে এসে না দাঁড়ায়, যদিবা সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দেন তাহলে আল্লাহর নির্দেশে পাওনাটুকু আদায় করে নিতে হবে। এ কোনো আপোশকামিতা নয়, ইসলামি মূল্যবোধ আর চিরায়ত ধর্মবিশ্বাস নজরুলের কবিতায় এভাবেই উঠে এসেছে। যেমন–

নাই হলো মা বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার
আল্লাহ আমার মাথার মুকুট রসূল গলার হার ॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি

ওতেই আমায় মানায় ভারি
কলমা আমার কপালের টিপ
নাই তুলনা তার ॥

আগেও লিখেছি, ভোগের চেয়ে ত্যাগের কথাই বেশি করে বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে, স্বভাবতই ধর্মের অনুশাসনের কথা, সমবণ্টনের কথা নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা ও গানে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বাংলা সাহিত্যে নজরুল ছাড়া অন্য কোনো কবি ঈদ নিয়ে এতটা লেখেননি। ইসলামের শিক্ষা– কপাটতার বিরুদ্ধে, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। ব্যক্তি নজরুল, কবি নজরুল ইসলাম কখনোই ধর্মান্ধ ছিলেন না। নজরুলের চিন্তা ও চেতনাজুড়ে ইসলামের বিধান ছিল সমুন্নত। তাঁর কবিতা ও গানে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও ফিতরার কথা বলা হয়েছে। ইহকালের চেয়ে পরকালের সঞ্চয়ের কথা মনে করিয়ে দিতেও ভুল করেননি নজরুল–

এল রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারি ভোল
সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল ॥
এই একমাসে রোজা রেখে, পরহেজ থাক গুনাহ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামত তোর ঝুলি ভরে তোল ॥

দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর, আত্মসংযমের পরীক্ষা শেষে পশ্চিমাকাশে যখন ঈদের চাঁদ দেখা যায় তখনই প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের হৃদয়-মনজুড়ে ঈদের আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যায়। নজরুল কণ্ঠে উচ্চারিত হয়–

এল ঈদুল ফিতর এল ঈদ, ঈদ ঈদ
সারা বছর যে ঈদের আশায় ছিল নাকো নিদ।
রোজা রাখার ফল ফলেছে দেখ রে ঈদের চাঁদ
সেহেরি খেয়ে কাটল রোজা, আজ সেহেরা বাঁধ।

ঈদ আনন্দ হোক সবার জন্য। অন্তত পক্ষে ঈদের দিনে আমরা সবাই মনের কালিমা দূর করে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাথে বুক মিলিয়ে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নেব, পরস্পর সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতি বিলিবণ্টন করে নেব, তাহলেই আমাদের জীবনের ঈদ আনন্দ সার্থক এবং সুন্দর হয়ে উঠবে। হাজারো আর্থিক কষ্টের ও অভাব-অনটনের মাঝে ঈদ আনন্দ সর্বত্র ছড়িয়ে যাক, প্রশান্তির সুবাতাস বয়ে যাক সর্বত্র। আত্মীয়-পরিজন বেষ্টিত কোলাহলমুখর পরিবেশে ঈদ উৎসব সবার জন্য আনন্দের ডালি সাজিয়ে দিক– এমন আশাবাদই ব্যক্ত করেছেন কবি।

ঈদ মোবারক হোক আজি ঈদ মোবারক হোক
সবঘরে পৌঁছুক এ ঈদের চাঁদের আলোক
যে আছে আজ প্রাণের কাছে আপন পুরে
যে পরদেশে যার লাগি নয়ন ঝুরে
আজ সবারে বারে বারে খোশ খবরি হোক।

একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের গান ও কবিতায় যেভাবে ঈদ চিত্রিত হয়েছে, যেভাবে ঈদের ত্যাগ ও আনন্দের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যেভাবে ইসলামের অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে– তা অন্য কোনো কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

উল্লিখিত যাবতীয় উদ্ধৃতাংশে কাজী নজরুল ইসলামের লেখক সত্তায় 'ঈদুল ফিতর' কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তারই নমুনা তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'ঈদ' নাটিকায় মাহতাবের কণ্ঠে বলেন–

আমি আল্লাহকে পেলাম। অর্থাৎ
তাঁরই অস্তিত্ব তাঁরই ইচ্ছার সৃষ্টি
তোমাদের সকলকেই পেলাম। তাই
আমার 'ঈদ' ফুরায় না, আমার ঈদ
ফুরায় আবার আসে।

সবশেষে কবির ভাষায় আমরাও বলি, আমাদের ঈদ ফুরায় না।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

সিএনডি-এর সদস্য বাংলাদেশ

আগামী তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য বিষয়ক কমিশন (সিএনডি)-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক)-এর সহযোগী সংস্থা সিএনডি-এর নতুন পরিষদ ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইকোসকের ব্যবস্থাপনা সভায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ ভোটে ২০শে এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে সংস্থাটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। নির্বাচনে জয়লাভের পর সভায় উপস্থিত জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা তার বক্তব্যে বলেন, সিএনডি'র এই নির্বাচনটি ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ। বাংলাদেশ এতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে (৪৩ ভোট)। এই বিজয় বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের নেতৃত্বের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থারই বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে কমিশনের সদস্য হিসেবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য বিষয়ক কমিশন ৫৩ সদস্যের একটি সংস্থা। কমিশনটি বৈশ্বিক মাদকদ্রব্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস বিবেচনা এবং রেজুলেশন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়ক সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এর সদর দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত।

প্রতিবেদন : নওশান আহমেদ

কবি নজরুলের মানিকগঞ্জ সফর: একটি অনুসন্ধান

শ্যামল কুমার সরকার

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে বর্তমান বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে) বারবার এসেছেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) প্রায় প্রতিটি জেলায় সফর করেছেন। নজরুলের পদচিহ্ন পেয়ে ধন্য হয়েছে এসব অঞ্চলও। নজরুলের জীবনে মানিকগঞ্জের স্থান অনন্য। কারণ, মানিকগঞ্জের তেওতা নজরুলের প্রিয়তমা প্রমীলার জন্মস্থান ও শৈশব কাটানোর জায়গা। মানিকগঞ্জ নজরুলের শ্বশুরবাড়ি। কাজী নজরুল ইসলামের মানিকগঞ্জে আসা-যাওয়া নিয়ে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। কারণ, নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) জীবনঘনিষ্ঠ কেউ বেঁচে নেই। এছাড়া দেশভাগের ফলে নজরুল সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজও হারিয়ে গেছে। আকর তথ্যের অভাবে নজরুলের জীবন বিষয়ক অনেক কাল্পনিক তথ্য লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রচার হয়েছে। এমনকি এ ধারা এখনো বহমান। তবে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ/নিবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যা মানিকগঞ্জে নজরুল বিষয়ে নতুন নতুন তথ্যসমৃদ্ধ করেছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ইতিহাস অনুসন্ধানে ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মানিকগঞ্জে নজরুল সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

'মানিকগঞ্জে নজরুল' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে মিয়াজান কবীর লিখেছেন, 'দোল উৎসবে ১৯২২ সালে কবি নজরুল প্রমীলার চাচাত ভাই বীরেন সেনের সঙ্গে বেড়াতে আসেন মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রামে। তেওতার নির্ঝর প্রান্তর আর সবুজ শ্যামল মায়ায় কবি ব্যাকুল হয়ে উঠেন। পথে-প্রান্তরে ছুটে বেড়ান কবি। জমিদার বাড়ির শান বাঁধানো ঘাটে বসে আপন মনে বাঁশিতে সুর তোলেন। আবার কখনো সাঁতার কেটে এপাড় থেকে ওপাড় গিয়ে হো হো করে হেসে উঠেন খেয়ালি কবি'।[১]

একই প্রবন্ধে মিয়াজান কবীর আরো লিখেছেন, '১৯২২ সালে ধূমকেতু পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার দায়ে কবি নজরুল ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন। এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার সঙ্গে তেওতা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন'।[২]

মিয়াজান কবীর প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী আরো জানা যায়, '১৯২৪-১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জ শহরে রজনী মোহন (রজনীকান্ত) বসাক, প্রিয়নাথ গুপ্ত আর অরুন রায়ের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনের চেতনাভিত্তিক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কবি নজরুল তাঁর জ্বালাময়ী কবিতা 'কারার ঐ লৌহ কপাট' আর 'শিকল পরা ছল মোদের ঐ শিকল পরা ছল' আবৃত্তি করে জনমনে জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানিকগঞ্জবাসী হর্ষ করতালিতে কবিকে জানান অভিনন্দন'।[৩]

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মত্ত গ্রামের সাবেক বাসিন্দা ত্রিপুরা শংকর সেন (১৮৯৭-১৯৮২) একটি স্মৃতিকথায় কবি নজরুল সম্পর্কে লিখেছেন, 'মনে পড়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে (তাঁর প্রবন্ধ লেখার) পূর্ববঙ্গে একটি মফস্বল শহরে (ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জে) একটি সাহিত্য সম্মেলনে কাজী সাহেবকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। মুখমণ্ডলে দুর্জয় সংকল্প ও বলিষ্ঠ পৌরুষের ছাপ। কথাবার্তায়, আবৃত্তি ও গানে উজ্জ্বল প্রাণ প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ছে, সাহিত্য সম্মেলনে বা সাহিত্যিক মজলিসে এবং সম্মেলনের বাইরেও দেখেছি কবিকে। স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ জানালে তিনি দশটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, একটি গান গাইতে অনুরোধ করলে গানের মালা গেঁথে চলেছেন'।[৪]

'১৯৩৯ সালে কবি নজরুল মানিকগঞ্জ শহরে তেজেন্দ্র মিত্র মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। ঐ বাড়ির আঙ্গিনায় জামগাছের ছায়ায় বসে কবি তাঁর 'রুমু ঝুমু রুমু ঝুম কে এল নূপুর পায়' ও 'শুকনো পাতার নূপুর পায়' গান দুটি পরিবেশন করেন'।[৫]

মানিকগঞ্জ অঞ্চলের কাহিনি অবলম্বনে কবি লিখেছেন 'পদ্ম গোখরো'।[৬]

কবি তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক পত্রগল্প 'হারাছেলের চিঠি'-তে এঁকেছেন তেওতার চিত্রকল্প। কবি লিখেছেন, 'সেদিন আসন্ন বিকালে এই

গোয়ালন্দের ঘাটে পদ্মার বুকে স্টিমারে রেলিং ধরে ঐ ওপারে মানিকগঞ্জের সবুজ সীমারেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার বুক চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। তুমি যে বলেছিলে ঐখানে ঐ অপর পারের সুনীল রেখায় আমাদেরও ঘর ছিল'।[৭]

একই পত্রগল্পে আরেকবার মানিকগঞ্জের উল্লেখ আছে। 'ও-পারে মানিকগঞ্জের সীমানা সবুজ রেখায় আঁকা। এ-পারে ফরিদপুরের ঘন বনছায়া'।[৮]

তেওতার স্মৃতি ধারণ করে কবি 'ছোট হিটলার' নামে একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি কবি পুত্রদ্বয়ের (সানি, নিনি) জবানীতে লেখা–

'মা গো! আমি যুদ্ধে যাব, নিষেধ কি মা আর মানি?/ রাত্রিরে রোজ ঘুমের মাঝে ডাকে পোল্যান্ড, জার্মানি।/ ভয় করি না 'পোলিশ'দেরে, জার্মানির ঐ ভাঁওতাকে/ কাঁপিয়ে দিতে পারি আমার মামার বাড়ি তেওতাদে'।[৯]

'নজরুল-প্রমীলার স্মৃতিধন্য তেওতা জমিদার বাড়ি' প্রবন্ধে নওশাদ জামিন ও সাব্বিরুল ইসলাম লিখেছেন, 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানিকগঞ্জে এলে এখানেই উঠতেন। মাঝেমধ্যে পুকুর ঘাটের সিঁড়িতে বসতেন। হাতে থাকত বাঁশি। তাতে তুলতেন মনমাতানো সুর। গাইতেন গান'।[১০]

জানা যায়, কবি মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় তেওতা জমিদার বাড়ির পুকুরে স্নানরত আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে দুলিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পুকুর ঘাটে বসেই লিখেন, 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়/সে কি মোর অপরাধ'।[১১]

উল্লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে আরো জানা যায়, 'কবি নজরুল পাঁচবার মানিকগঞ্জে আসেন। প্রথমবার তিনি ১৯২২ সালের জুন মাসে বীরেন কুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে তেওতায় বেড়াতে আসেন। পরে কবি আরো তিনবার এখানে আসেন। আরেকবার ফরিদপুর থেকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি তেওতা আসেন। তিনি দুদিন প্রমীলাদের বাড়িতে ছিলেন'।[১২]

'প্রমীলা দেবীর আত্মীয়রা রক্ষণশীল হিন্দুদের সমালোচনার ভয়ে তাঁকে তেওতায় না রেখে মানিকগঞ্জ শহরে তেজেন মিত্রের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তেজেন মিত্র ছিলেন প্রমীলা দেবীদের আত্মীয়'।[১৩]

জানতে পারা যায়, 'তেজেন মিত্রের বাড়িতে কবি কয়েকদিন অবস্থান করেন। ভারত ভাগের সময় তেজেন মিত্ররা পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেই বাড়িটি আজ আর নেই। হারিয়ে গেছে জামগাছটিও। তবে পুকুরটি আজও আছে। নজরুল এ বাড়িতে বসেই রচনা করেন– 'জলকে চলেলো কার ঝিয়ারী'।[১৪]

'স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে মানিকগঞ্জ মডেল হাই স্কুলে এক অনুষ্ঠানে কবিকে নিয়ে আসা হয়। কবি এখানে পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে স্কুল কম্পাউন্ডে প্রধান শিক্ষক আলতাফ হোসেনের বাড়িতে বিশ্রামে রাখা হয়। আর স্কুলের দোতলায় নজরুল পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে কবিপুত্র সব্যসাচী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন'।[১৫]

'নজরুলের শ্বশুরবাড়ি মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার তেওতা গ্রামে। জমিদার হরশঙ্কর রায়ের বড়ো অট্টালিকা ও আঠারো শতকের গোড়ায় স্থাপিত নবরত্ন বিহার তথা পুরাকীর্তির জন্যও তেওতা বিখ্যাত। জমিদারের বাড়ির গা ঘেঁষে অবস্থিত সেনগুপ্ত পরিবারের বাড়ি। নজরুল এ বাড়িতে এসেছেন'।[১৬]

আবু হেনা আব্দুল আউয়াল আরো লিখেছেন, 'তবে একথা ঠিক তিনি (নজরুল) মানিকগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার তেওতা গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যান এবং একাধিকবার যান'।[১৭]

শ্রীমতী উষা সরকারের 'পূণ্যভূমি মানিকগঞ্জ' শিরোনামের স্মৃতিজাগানিয়া লেখা থেকে জানা যায়, 'রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা মানিকগঞ্জকে করেছে গৌরবান্বিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, জলধর সেন প্রভৃতি বরেণ্যদের আহ্বান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল মানিকগঞ্জ। জমিদার কাছারির মাঠে সুউচ্চ মঞ্চে নেতাজীর বক্তৃতারত দৃপ্তমূর্তি মানিকগঞ্জের প্রতিটি লোকের হৃদয়ে আঁকা হয়ে আছে। এমন বহু উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আমরা দেখেছি থিয়েটার হলে'।[১৮]

মানিকগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে শোনা যায় যে, ১৯২৪ বা ১৯২৬ সালের দিকে এখানে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন রজনী বসাক। এতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজে তাঁর দুটি গান গেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।[১৯]

১৯২৪-১৯২৬ এই সময় জমিদার কিরণশঙ্কর রায়ের আমন্ত্রণে সুভাষ বসু ও নজরুল তেওতা জমিদার বাড়ি ও নবরত্ন মঠ পরিদর্শন করেন। জমিদার কিরণশঙ্কর নজরুলের সাথে স্বাধিকার আন্দোলন, তাঁর কবিতা, গান বিষয়ে মতবিনিময় করেন বলে জানা যায়'।[২০]

অনুসন্ধানে জানা যায়, 'নজরুলও নবরত্নটি দারুণ পছন্দ করতেন। নজরুল গান গাইতেন ও এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি কবিতা-গানের উপকরণ খুঁজে পেতেন। প্রথমবার নজরুল তেওতা জমিদার বাড়ি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন বলে জানা যায়'।[২১]

জানা যায়, 'উচ্চ শিক্ষিত ও রুচিবান জমিদার কিরণশঙ্কর রায় বিশুদ্ধ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রাসাদে প্রায় সময়ই গানের আসর বসতো। নজরুলের গান ও কবিতার কথা তাঁর কানে পৌঁছতে বিলম্ব হয় না। তিনি নজরুলকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। জমিদারের প্রাসাদে তিনি সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন গান ও কবিতা পরিবেশন করেন।

নজরুলের বিপ্লবাত্মক কবিতা ও গান ছাড়াও কীর্তন জমিদারের মন কেড়ে নেয়'।[২২]

'নজরুলের সাথে প্রমীলার বিয়ের খবর পেয়ে জমিদার কিরণশঙ্কর আনন্দিত হন। তাঁদের তেওতায় নিমন্ত্রণ জানান। নজরুল নববধূ প্রমীলাকে নিয়ে তেওতায় এলে জমিদার বাবু রীতিমতো সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এ পর্যায়ে নজরুল দম্পতি প্রায় দুসপ্তাহ তেওতায় ছিলেন এবং তিন-চার দিন জমিদার বাড়িতে নজরুলের গান ও কবিতা পাঠের আসর বসে'।[২৩]

নজরুলের বিয়ের পূর্বে তেওতা আগমন, প্রমীলার সঙ্গে দেখা, বিয়ের পর নবদম্পতি হিসেবে তেওতা আগমন, জমিদার বাড়িতে সংগীতের আসরে গান গাওয়া, নবরত্ন মঠ থেকে যমুনা দর্শন ও যমুনার তীরে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতিতে তিনি অনেকগুলো কবিতা ও গান রচনা করেন। তাদের কয়েকটি হলো : ১. নীলাম্বরী শাড়ি পরে নীল যমুনায়... ২. ওরে নীল যমুনার জল ... ৩. কেন প্রেম যমুনা আজি... ৪. গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ ... ৫. যমুনা-সিনানে চলে... ৬. এস নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া ... ৭. শাওন রাতে যদি... যমুনা নদী কূলে।[২৪]

'লিচু চোর' কবিতাটিও নজরুল তেওতায় বসে লিখেছেন বলে জানা যায়। তেওতা জমিদার বাড়ি একটি বড়ো পুকুর পাড়ে অবস্থিত। এ জমিদার বাড়িটি 'বাবুবাড়ি' ও পুকুরটি 'তালপুকুর' নামে পরিচিত। পুকুর পাড়ে লিচু ও তালগাছ এখনো আছে। একদিন পুকুর পাড়ের লিচুগাছ থেকে পড়ে একটি ছেলে কাস্তে হাতে দৌড়াচ্ছে আর পিছে মালি ও কুকুর তাড়া করছে– এ দৃশ্যের স্মৃতিতেই নজরুল 'লিচু চোর'[২৫] কবিতাটি লিখেন বলে মনে করা হয়।

অন্য একটি প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, 'তেওতা গ্রামটি আরো বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী প্রমীলার স্মৃতি জড়িয়ে থাকায়। তেওতা গ্রামের মেয়ে প্রমীলা জমিদার বাড়ির পাশের বসন্ত কুমার সেন এবং গিরিবালা সেন দম্পতির মেয়ে। তবে তাঁর ডাক নাম ছিল দুলি'।[২৬]

'জমিদার হেমশংকর রায় প্রমীলাকে খুব আদর করতেন। জমিদার বাড়ি বেড়াতে এসে নজরুল ইসলাম মাঝে মধ্যে রাতে গান-বাজনার আসর জমাতেন। প্রথমে প্রমীলা দেবীকে দেখে কবি নজরুল ইসলাম মুগ্ধ হয়ে 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ' গানটি রচনা করেন। দুলি তখন ছিলেন ছোটো। মাঝে মধ্যে নজরুলকে পান বানিয়ে হাতে তুলে দিতেন। প্রমীলা দেবী নজরুলকে কবি বলে ডাকতেন'।[২৭]

'সুস্থাবস্থায় নজরুল বাংলাদেশের বহু অঞ্চল সফর করেন। তারমধ্যে মানিকগঞ্জ অন্যতম। বৈবাহিক সূত্রেও মানিকগঞ্জের তেওতা নজরুল জীবন ও মানসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নজরুলের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা তেওতায় অবস্থানকালে রচিত হয়েছে'।[২৮]

'নজরুল বেশ কয়েকবার মানিকগঞ্জ জেলায় এসেছিলেন। মানিকগঞ্জের মানুষ নজরুলকে ভালোবেসে সংবর্ধনা দিয়েছে। নজরুল-প্রমীলা স্মৃতিবিজড়িত মানিকগঞ্জের তেওতায় জাতীয় নজরুল সম্মেলন আয়োজন করায় মানিকগঞ্জের জনগণ বিশেষভাবে আনন্দিত'।[২৯]

কবি নজরুল মানিকগঞ্জের তেওতা জমিদার বাড়ি ও তেওতার প্রমীলাদের বাড়ি, মানিকগঞ্জ মহকুমা শহরের সারস্বত ভবন,

অসুস্থ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তেজেন মিত্রের বাড়ি এবং মানিকগঞ্জ শহরের মডেল হাই স্কুলে এসেছেন। এর মধ্যে সারস্বত ভবনে (বর্তমানের শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ী, পৃ. ৪১৮, *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, ২০১২) আগমনের সাল ১৯২৪ (১৯২৬) এবং মানিকগঞ্জ শহরের মডেল হাই স্কুলে প্রধান অতিথি হয়ে আগমনের বছর ১৯৭৪। অনুসন্ধান করে মানিকগঞ্জ শহরে নজরুলের পদচিহ্নের স্মৃতিধন্য সারস্বত ভবনের (সারস্বত নাট্য সমাজ মন্দির) স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে (বর্তমানের কালীবাড়ী, *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৫৩৫)। আশার কথা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানিকগঞ্জ শহরের মডেল হাই স্কুলের তৎকালীন ছাত্র (১৯৭৪) বর্তমানের প্রভাষক ও প্রসিদ্ধ আবৃত্তি শিল্পী আগস্ট ২০১৯ প্রবন্ধকারকে জানিয়েছেন, '১৯৭৪ সালের সে দিনটির কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কবিকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে ছিলাম। তিনি এলেন। ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হলো। দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় কবি মঞ্চে থাকতে পারলেন না। দীর্ঘ দেহী ও ঝাঁকড়া চুলের কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী নজরুলের 'বিদ্রোহী' সহ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে ফেললেন'।[৩৬]

নজরুলের মানিকগঞ্জ শহরে তেজেন মিত্রের বাড়িতে আগমনের বিষয়ে তাঁর (১৯৪৭-এ দেশত্যাগ) বাড়ির (রিজার্ভ ট্যাঙ্কের দক্ষিণে নির্মাণাধীন সিআরপি'র পাশে) বর্তমান বাসিন্দা বিশিষ্ট তবলা বাদক ও সংস্কৃতিকর্মী নিরঞ্জন মিত্র এ অনুসন্ধানকারীকে জানান (সেপ্টেম্বর ২০১৯), 'আমার দাদা নরেন্দ্র নাথ মিত্র তেজেন

মিত্রের কাছ থেকে তাঁর বসত বাড়িটি খরিদ করেছিলেন। আমার বাবা সুরেন্দ্র নাথ মিত্রের কাছ হতে আমি নজরুল ইসলামের তেজেন মিত্রের বাড়িতে আসার কথা শুনেছি'।[৩৭]

ক্রয়সূত্রে প্রমীলার জন্মভিটার বর্তমান মালিক (৫০/৫২ বছর ধরে) তেওতায় সাক্ষাতে এ গবেষককে বলেছেন, (এপ্রিল ২০১৯), 'আমি দেখিনি কিন্তু শুনেছি তেওতা জমিদার বাড়িতে এবং তেওতায় প্রমীলাদের বাড়িতে কবি নজরুল একাধিকবার এসেছেন। তবে স্বাধীনতার পরে কবিপুত্র সব্যসাচী, উমা কাজী, খিলখিল কাজীসহ অন্যান্যরা প্রমীলার জন্মভূমি দেখতে আমার বাড়িতে (যে বাড়িতে প্রমীলা জন্ম নিয়েছিলেন) এসেছিলেন। আমি নিজ হাতে তাঁদের আপ্যায়িত করেছি'।[৩৮] ড. কাজী মোজাম্মেল হোসেন লিখেছেন, 'এক পর্যায়ে তিনি মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রামেও বেড়াতে এসেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি মানিকগঞ্জ শহরের দু'এক বাসায় নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবেও ঘুরে বেড়িয়েছেন।[৩৯] ড. কাজী মোজাম্মেল হোসেন আরো জানিয়েছেন, 'তবে নজরুল যে মানিকগঞ্জ এবং তেওতায় ১৯২২ সালে এসেছিলেন তাতে কোনো দ্বিমত নেই। কুমিল্লা আসা-যাওয়া ও অবস্থানের মাঝেই তিনি প্রথমে মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রাম ও পরে মানিকগঞ্জ শহরে বেড়িয়ে যান এবং মানিকগঞ্জকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেন'।[৪০] মো. আজহারুল ইসলাম লিখেছেন, 'কাজী নজরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে প্রমীলা একাধিকবার তেওতা গ্রামে এবং মানিকগঞ্জে এসেছিলেন। এ সময় তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেছিলেন'।[৪১] আলী হোসেন চৌধুরীর বর্ণনা মতে, 'অনুসন্ধানে জানা যায় নজরুল তেওতা গ্রামে প্রমীলা ও বীরেন সেনসহ বেড়াতে গিয়েছিলেন কোনো এক দুর্গা পূজার সময় তাঁদের বিয়ের আগে। বীরেন সেন প্রমীলার কাকাতো ভাই ও নজরুলের বন্ধু। নজরুল-প্রমীলার বিয়ে হয়েছিল ১৯২৪ সালের এপ্রিলে। সুতরাং নজরুল এখানে এসেছিলেন আরো আগে তা সহজেই অনুমেয়'।[৪২] মানিকগঞ্জ শহরের সিনিয়র সিটিজেন শংকর ঘোষ (৭৭) জানিয়েছেন, কবি নজরুল মানিকগঞ্জ শহরের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ লতিফ বিশ্বাসের বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সাল-তারিখ জানাতে পারেননি (অক্টোবর ২০১৯)। শহরের আরেক সিনিয়র সিটিজেন প্রবীর চৌধুরী (৭৪) নজরুলের মানিকগঞ্জ শহরের আগমনের কথা জানালেও কোনো দালিলিক প্রমাণ দিতে পারেননি (অক্টোবর ২০১৯)।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানিকগঞ্জের মাটিতে তাঁর পদচিহ্ন রেখে গেছেন একাধিকবার।

তথ্যসূত্র

১. মিয়াজান কবীর, 'মানিকগঞ্জে নজরুল', আব্দুল হাই শিকদার সম্পাদিত *সর্বজনীন নজরুল*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৬৫
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৬
৪. ত্রিপুরা শঙ্কর সেন, 'কবি নজরুলের ধ্যানে দেশ-মার্তৃকা ও জগন্মাতা', *নজরুল স্মারকগ্রন্থ*, সালাম-আজাদ সম্পাদিত, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৭
৭. কাজী নজরুল ইসলাম, হারাছেলের চিঠি, *নজরুল সমগ্র*-১২, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২২৩
৮. প্রাগুক্ত
৯. কাজী নজরুল ইসলাম, ছোট হিটলার, *নজরুল সমগ্র*-৪, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৯
১০. নওশাদ জামিন ও সাব্বিরুল ইসলাম, 'নজরুল-প্রমীলার স্মৃতিধন্য তেওতা জমিদার বাড়ি', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ২৫শে মে ২০১২
১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. আবু হেনা আব্দুল আউয়াল, 'মানিকগঞ্জে নজরুল', জাতীয় নজরুল সম্মেলন, তেওতা, মানিকগঞ্জ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ও জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ, ২০১৫, পৃ. ২১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৮. মানিকগঞ্জ সুহৃদ সম্মিলনী স্মরণিকা, ১৩৩ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০২৯, ১৯৮৩ (*মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, ২০১২, পৃ. ৪৪২)
১৯. মুন্সি শাহাবুদ্দীন আহমেদ, জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ, *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, ২০১২, পৃ. ২৩২
২০. কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, 'নজরুল-প্রমীলা ও তেওতা', জাতীয় নজরুল সম্মেলন, তেওতা, মানিকগঞ্জ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ও জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ, ২০১৫, পৃ. ২৪
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২৬. রামপ্রসাদ সরকার দীপু, 'কবি নজরুল স্মৃতিবিজড়িত তেওতা জমিদার বাড়ি জৌলুস হারাচ্ছে', *সংবাদ*, ঢাকা, ২০শে এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১২
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. আসাদুজ্জামান নূর, মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৯. জাহিদ মালেক, প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩৬. বাসুদেব সাহা, প্রভাষক ও আবৃত্তি শিল্পী, মানিকগঞ্জ
৩৭. নিরঞ্জন মিত্র, তবলাবাদক ও সংস্কৃতিকর্মী, মানিকগঞ্জ
৩৮. নেপাল চন্দ্র ঘোষ, প্রমীলার জন্মভিটার বর্তমান মালিক, তেওতা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
৩৯. ড. কাজী মোজাম্মেল হোসেন, *নানা অঙ্গনে নজরুল*, ২০১৯, ঢাকা, পৃ. ১৫৪
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৪১. মো. আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৯৫
৪২. আলী হোসেন চৌধুরী, *নজরুল ও বাংলাদেশ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৯

লেখক: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, ঝিট্‌কা খাজা রহমত আলী কলেজ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ এবং প্রতিষ্ঠাতা ও গবেষক, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, মানিকগঞ্জ।

জগৎমল্লপাড়া গণহত্যা

কাজী সালমা সুলতানা

মধ্যযুগের কবি দৌলত কাজী, গুলে বকাওলি খ্যাত মোহাম্মদ মকিম কিম্বা একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'– লেখক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতি বিজড়িত রাউজান। মাস্টারদা সূর্যসেনসহ অসংখ্য বিপ্লবী ও বিদ্রোহীর জন্মস্থান চট্টগ্রামের রাউজান। ১৯৭১ সালে রাউজানের আত্মত্যাগও কম গৌরবের না। একাত্তরে এই রাউজান সাক্ষী হয়েছে রক্তাক্ত এক নির্মমতার। ১৩ই এপ্রিল একদিনেই রাউজানের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ২০০ জনকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। সেদিনের গণহত্যায় জগৎমল্লপাড়া গণহত্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে মাত্র আধা ঘণ্টায় ৩৯ জনকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। একইসঙ্গে হত্যা করা হয় জগৎমল্ল সন্নিহিত কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নূতন চন্দ্র সিংহকে।

নূতন চন্দ্র সিংহ

জগৎমল্লপাড়া গণহত্যা সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে গবেষণা করেছেন ড. চৌধুরী শহীদ কাদের। তাঁর 'জগৎমল্লপাড়া গণহত্যা' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালে রাউজানে পাকিস্তানি বাহিনীর আগমনের পর জগৎমল্লপাড়ার লোকজন সতর্ক হয়ে যায়। সংখ্যালঘুদের অনেকেই জগৎমল্লপাড়া ছেড়ে চলে যায়। দেশের এমন অবস্থাতেও নূতন চন্দ্র ভারতে যেতে রাজি হন নাই। তিনি বলতেন, 'আমি তো কারো ক্ষতি করিনি, জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। এই শেষ বয়সে নিজের দেশ মাটি আর আরাধ্য দেবী কুণ্ডেশ্বরীকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। যদি মরতে হয় এখানেই মরবো। এখানে যদি মৃত্যু হয় তাহলে জনাব এই আমার নিয়তি।' অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমি বেদ উপনিষদ, কোরআন ও বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেশ থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও তাকে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি দেশ ত্যাগে রাজি হন নাই। বরং পাকিস্তানি আর্মিরা যে-কোনো সময় আসতে পারে এই অনুমানে তিনি আগেভাগেই বাড়ির উঠানে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রেখেছিলেন।

জগৎমল্লপাড়ার হিন্দু পরিবারগুলো ১১ই এপ্রিল জানতে পারে রাউজান কলেজে পাকিস্তানিরা ক্যাম্প করেছে। ১৩ই এপ্রিল সকালে গোলাগুলির শব্দ শুনে অনেকে জগৎমল্লপাড়া ছেড়ে চলে যায়। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী দ্বিজয়চন্দ্র কৃষ্ণ সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ১৩ই এপ্রিল সকাল নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার দিকে আমার বাবা-মা, ভাই ও বৌদিসহ আমরা ডাবুয়ায় আমার মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হই। কিন্তু অধিকাংশ লোক নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেনি। তারা ভেবেছিল নিরীহ এই গ্রামবাসীর ওপর কেনই-বা পাকিস্তানি বাহিনী হামলা চালাবে। অন্যদিকে স্থানীয় রাজাকার মাবুদ, গোলাম আলী, নওয়াব মিয়া, মোহাম্মদ বখশসহ অন্যরা গ্রামবাসীকে অভয় দেন যে, তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। কিন্তু কুণ্ডেশ্বরীতে নূতন চন্দ্র সিংহকে হত্যার পর ঘাতকের দল আসে জগৎমল্লপাড়ায়। সেখানে নন্টু মেম্বারের উঠানে দাঁড়িয়ে তারা মিটিংয়ের কথা বলে। কেউ মিটিংয়ের কথা শুনে স্বেচ্ছায়, কাউকে জোর করে নিয়ে আসা হয়। সতীশ চন্দ্রের বাড়ির সামনে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করানো হয়। ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় জগৎমল্লপাড়ার ৩৬ জন সদস্যকে।

সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ১৩ই এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মাঝে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী স্থানীয় সহযোগীসহ পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত জগৎমল্লপাড়ায় সশস্ত্র অভিযান চালায়। এ সময় সাকা চৌধুরীর দুজন সহযোগী আব্দুল মাবুদ ও অপর একজন জগৎমল্লপাড়ায় হিন্দু নরনারীদের সবাইকে কথিত এক মিটিংয়ে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তাদের কথা বিশ্বাস করে এলাকাবাসী কিরণ বিকাশ চৌধুরীর বাড়ির আঙিনায় একে একে জড়ো হতে থাকে সবাই। তাদের একত্র করে বসানো হয়। এখানে গুলিতে মারা যায় ৩২ জন।

জগৎমল্লপাড়া গণহত্যায় শহিদ হন ৪০ জন। ১৩ তারিখ সকাল ১১টায় পাকিস্তানি সেনারা জগৎমল্লপাড়ায় আসে। এইদিন ৩৬ জনকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে। এরপর মে মাসে পুনরায় পাকিস্তানি বাহিনী জগৎমল্লপাড়ায় আসে। এইদিন হত্যা করা হয় আরো তিনজনকে। দুই দফায় শহিদের সংখ্যা ৪০ জন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা যে গণহত্যা চালিয়েছিল, তা ইতিহাসে বিরল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও হার মানায়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা যাঁদের হারিয়েছি, তাঁদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁরাই গৌরব ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী ও প্রাবন্ধিক

চলচ্চিত্রে তামাক সেবনের দৃশ্য ধূমপানে তরুণদের উৎসাহী করে

সৈয়দা অনন্যা রহমান

৩১শে মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। ১৯৮৭ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তামাকের কারণে সৃষ্ট মহামারি ও প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের সূচনা করেছিল। প্রতিবছর সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। প্রতিবছর দিবসটির জন্য একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এ বছর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ব্যবহারের কারণে কোভিড আক্রান্তে ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে–'আসুন প্রতিজ্ঞা করি, জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি'।

একসময় গ্রামে তামাক বা হুক্কা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হতো। ধীরে ধীরে তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের দ্বারা মানুষকে আপ্যায়িত করার ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। জনস্বাস্থ্য অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আরো সুন্দর ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সভ্যতার ক্রমবিকাশে নতুন নতুন ইতিবাচক বিবেচনা বোধের বিকাশ ঘটছে। পাশাপাশি সাময়িক সুখের জন্য অপ্রয়োজনীয় কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, অপ্রয়োজনীয় কিছু বিলাসিতারও বিকাশ ঘটেছে। তামাক ব্যবহার তেমনি একটি অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা। যা ক্ষুধা নিবারণ বা পুষ্টির জোগান দেয় না। দেয় শুধু অকাল মৃত্যু, পঙ্গুত্ব আর দারিদ্র্য। প্রতিবছর দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ তামাকের কারণে প্রাণ হারাচ্ছে। তামাক চাষের কারণে কমে আসছে জমির উর্বরা শক্তি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– এমন একটি ক্ষতিকর ও মরণঘাতী পণ্য ব্যবহারের দৃশ্য নাটক, সিনেমা বা চলচ্চিত্রের জন্য কতটা জরুরি।

চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন নয়, গণমানুষের জীবনে চলচ্চিত্রের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কোনো কোনো সময় মানুষের চিন্তা ও অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে চলচ্চিত্র। সুতরাং সিনেমা, নাটকে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইদানীং কোনো কোনো নাটক-সিনেমায় নায়ক, ভিলেন, বাড়ির কাজের লোক, এমনকি নারী চরিত্রকেও ধূমপান করতে দেখা যায়। সকল চরিত্রের হাতে সিগারেট তুলে দিয়ে আসলে কী বোঝানো সম্ভব? অনেকেই দাবি তোলেন কাহিনির প্রয়োজনে চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনের আবশ্যকতা রয়েছে। তারা আরো দাবি করেন– নেতিবাচক চরিত্র বোঝাতে হলে এ ধরনের দৃশ্য প্রয়োজন। সিগারেট হাতে দিলেই কি কাউকে খারাপ চরিত্রের অধিকারী বোঝানো যায়? প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রের কাহিনির প্রয়োজনে ধূমপান দেখানো জরুরি নয়। বরং এ ধরনের দৃশ্য তরুণদের তামাক সেবন অভ্যাসে পরিণত করে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিশীলতা থাকলে তামাক ব্যবহার বা ধূমপানের দৃশ্য পরিহার করেও ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব। *জীবন থেকে নেওয়া*, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *পথের পাঁচালী*সহ আরো বহু জনপ্রিয় ও কালজয়ী চলচ্চিত্র রয়েছে যেখানে অনবরত ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজন হয়নি। বহু জনপ্রিয়, বিখ্যাত চলচ্চিত্রেও কিন্তু ভয়ংকর নেতিবাচক চরিত্রেও ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হয়নি। সুতরাং নাটক-সিনেমায় তামাক ব্যবহার বা ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা জরুরি।

তামাকের কারণে প্রতিবছর বহু লোক মারা যায়। এসকল ঘাটতি পূরণে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভোক্তা খোঁজে এবং অনেক সময় তাদের ভাবনা পরিচালক ও নির্মাতাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলে কোনো বাড়তি অর্থ ব্যয় না করেও তামাক ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাজে তামাকজাত চাহিদা তৈরি করিয়ে নেয়। নায়ক-নায়িকাসহ সিনেমায় যারা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলেন ধীরে ধীরে তাদের এক ধরনের তারকা খ্যাতি তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের কাছে তারা অনেক সময় স্বপ্নের মানুষে পরিণত হয়ে ওঠে। সমাজের লক্ষ-কোটি মানুষ এসব উজ্জ্বল তারকাদের অনুসরণ করে। রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গণমানুষদের প্রতি শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজকদের এক ধরনের দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র– এসকল ক্ষেত্রগুলোকে তামাকমুক্ত রাখা জরুরি।

বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক চুক্তি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনেও (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) এফসিটিসি বাস্তবায়ন তথা তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তামাকের সার্বিক ক্ষতি (স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশ) বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশে তামাকের ব্যবহার ৫%-এ নামিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সরকারের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

চলচ্চিত্র এবং ফ্যাশন জগতকে স্ট্রোক, হৃদরোগ বা ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগ সৃষ্টির দায়ে সরাসরি অভিযুক্ত না করা গেলেও পরোক্ষভাবে দায়ী করা যেতে পারে। তবে এসকল জগতের সাথে সম্পৃক্তজনেরা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারে না। জনকল্যাণকে বিবেচনায় রেখে তাদের মাধ্যমে এমন কোনো পণ্যের প্রচার করা উচিত নয় যেটি সরাসরি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে বা মারাত্মক ভয়াবহ সব রোগ

সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য সামাজিকভাবে সিগারেটকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ভূমিকা রাখে।[১] কখনো ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ, জ্ঞানের প্রখরতা, কখনো চিন্তা বা হতাশা, আবার কখনো বাউণ্ডুলে বা নেতিবাচক চরিত্র বোঝাতে সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, নাটক, সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য তরুণদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তারা ধূমপানকে স্বাভাবিক অভ্যাস বলে মনে করে এর স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি ভুলে যায় (*প্রথম আলো*, ১৭ই মার্চ ২০১৯)।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০০২ সালের নভেম্বরে বিনোদন শিল্প বিশেষ করে চলচ্চিত্র এবং ফ্যাশন জগতকে এ ধরনের একটি পণ্যের প্রচার বন্ধে আহ্বান জানায়। তারা সান ফ্রান্সিসকোর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মোকফ্রি ফিল্মস প্রজেক্টের সাথে যোগ দিয়ে বিনোদন ও ফ্যাশন শিল্পকে তামাকের প্রচারণামূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। বিশেষত এর মাধ্যমে হলিউড এবং বলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পগুলোকে তামাকের প্রচারণামূলক কার্যক্রম থেকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী এ আন্দোলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় –'Media and Tobacco: Get the Message Across' এবং ২০০৩ সালে 'Tobacco Free Film, Tobacco Free Fashion', যা প্রচার মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবিকে আরো জোরদার করে (World Health Organization (WHO), 2003)।

কোনো পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন মানুষকে সে পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে তোলে। পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই তারকাদের সিগারেটের পরোক্ষ বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর জন্য সিনেমার পিছনে তামাক কোম্পানি বিপুল অর্থ ব্যয়ও করার ইতিহাসও রয়েছে। ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবির উপর বার্নিং ব্রেইন সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এসময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ৮৯% ছবিতে তামাকের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ৬৭% ছবিতে প্রধান চরিত্রকে ধূমপান করতে দেখা গেছে। ৪১% ছবিতে তামাকের ব্র্যান্ড দেখানো হয়েছে। ২৭% ছবিতে তামাকের স্বাস্থ্য সতর্কবাণীকে তাচ্ছিল্য বা উপহাস করে দেখানো হয়েছে। ৩০%-এ তামাকের ইতিবাচক আগ্রাসী প্রচারণা সংবলিত বর্ণনা অথবা দৃশ্য দেখানো হয়েছে (Burning Brain Society, Hemant Goswami and Rajesh Kashyap, 2004-2005)। বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানি কর্তৃক চলচ্চিত্রে সহায়তার উদাহরণ রয়েছে। ২০১৭ সালে *ঢাকা অ্যাটাক* নামে একটি বিশাল বাজেটের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ পরিবার কল্যাণ সমিতি লি., থ্রি হুইলারস, প্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়ার সমন্বিত এই চলচ্চিত্রটিতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি)-এর সহায়তা ছিল। ঢাকা অ্যাটাক কর্তৃপক্ষ এজন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিএটিকে কৃতজ্ঞতাও জানায়। চলচ্চিত্রটি শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই প্রদর্শিত হয়।

১৯৯১ থেকে ২০০০ এই এক দশকে শীর্ষ ৫০টি সিনেমার উপর গবেষণা করে দেখা গেছে, ফিল্মে ধূমপান জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের কারণ। জনপ্রিয় মিডিয়াতে তামাক ব্যবহারের দৃশ্য তামাকের প্রসার বৃদ্ধি ও যুবকদের ধূমপানে আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে (C Mekemson1, 2004)। সিনেমাতে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনের ফলে কিশোরদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (U.S. Department of Health and Human Services, 2012)। ২০০২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যাবসা সফল সিনেমাগুলোর প্রায় অর্ধেক (৪৫%) তেরো বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবক ছাড়া দেখা নিষিদ্ধ ছিল। এ সিনেমাগুলোর প্রতি ১০টির মধ্যে ৬টিতেই ধূমপান অথবা অন্যান্য তামাক সেবন প্রদর্শন করা হয়। কিশোরদের উপর নির্মিত সিনেমাগুলোতে ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ১৩ বা ততধিক বছর বয়সের জন্য নির্মিত সিনেমায় তামাক সংক্রান্ত ঘটনাগুলো জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (Centers for Disease Control and Prevention, 2010-2016)। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, কিশোরদের জন্য নির্মিত সিনেমায় তামাক ব্যবহারের দৃশ্য কমিয়ে আনা হলে তাদের মধ্যে এসব ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসে। ১৭ বছরের কম বয়সি কিশোরদের জন্য তামাক ব্যবহারের দৃশ্য সংবলিত সিনেমাগুলোকে নিষিদ্ধ করা হলে কিশোর ধূমপায়ীদের সংখ্যা ১৮% কমিয়ে আনা সম্ভব।

তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে দেশে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়েই 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'-এ চলচ্চিত্রে তামাক ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের দৃশ্য দেখানোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান রাখা হয়েছে। আইনের ধারা ৫-এ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানের (ঙ)-তে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোনো সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করবে না বা করাবে না: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সিনেমার কাহিনির প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রয়েছে এমন কোনো সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক ইহা প্রদর্শন করা যাবে;

'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'-এর ৫-এ আরো বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। আইন অনুসারে, সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান (১) আইনের ধারা ৫-এর উপধারা (১)-এর দফা (ঙ)-এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো সিনেমার কাহিনির প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে এইরূপ কোনো সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করতে হইবে, যথা:

(ক) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করতে হবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে;

১ https://www.afro.who.int/news/world-no-tobacco-day-tobacco-free-film-and-fashion-stop-promoting-tobacco-dr-samba

(খ) টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হবার পর সম্পূর্ণ পর্দাজুড়ে কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করতে হবে; এবং

(গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দাজুড়ে 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করতে হবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫-এর এই সংক্রান্ত ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধানও প্রযোজ্য রয়েছে। উল্লিখিত আইনের ধারা ৫-এর উপধারা (৪) অনুসারে, কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হবেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করার পরও অনেকে বিষয়টিকে সঠিকভাবে মানছে না। তবে আশার কথা এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে ২০২০ সালেও *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বার্তা প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সরকারও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করছে। ২০১৮ সালে ব্যাপকভাবে ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর জন্য বাংলা চলচ্চিত্র *দেবী* দেশের তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়। দাবি তোলা হয় *দেবী* সিনেমাটিতে নতুন প্রজন্মকে ধূমপানে উৎসাহিত করা হয়েছে।[২] বিষয়টি গণমাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উঠে আসে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল থেকে উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড বরাবর পোস্টারটিতে ছবির নায়কের ধূমপানরত ছবি প্রদর্শন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ২০০৫-এর ৫ (ঙ)-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং তামাকজাত দ্রব্যের এক ধরনের পরোক্ষ প্রচারণা। যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। ভবিষ্যতে অন্য কোনো সিনেমার পোস্টারে ও চলচ্চিত্রে এরূপ ধূমপানের দৃশ্য যেন না থাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ মূলত বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়, এটি সমন্বিত একটি প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেশে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এগিয়ে এলে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি অসংক্রামক রোগের হার কমে আসবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

ফিলিপাইনের কালাম্বা শহরে অবস্থিত হোসে রিজাল জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ফিলিপিনো জাতীয় বীর ডা. হোসে রিজাল-এর যৌথ কাঠের প্রতিকৃতি সংবলিত একটি শিল্পকর্ম উন্মোচন করা হয়

ফিলিপাইনে বঙ্গবন্ধু ও হোসে রিজালের যৌথ প্রতিকৃতি উন্মোচন

ফিলিপাইনের কালাম্বায় অবস্থিত হোসে রিজাল জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ফিলিপিনো জাতীয় বীর ডা. হোসে রিজালের যৌথ কাঠের প্রতিকৃতি সংবলিত একটি শিল্পকর্ম উন্মোচন করা হয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ফিলিপিনো শিল্পী নিকোলাস পি আকা জুনিয়র-এর খোদাই করা এই শিল্পকর্মটি ফিলিপাইনের বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে রিজাল জাদুঘরে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ২১শে এপ্রিল ২০২১ রিজাল জাদুঘরে শিল্পকর্মটি উদ্‌বোধন করেন ফিলিপাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়াম এবং হোসে রিজাল জাদুঘরের কিউরেটর যারাহ এসকুয়েতা।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসে রিজাল বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মহান দুই নেতা- যারা ইতিহাসের সম্পূর্ণ ভিন্ন সময়ে ও প্রেক্ষাপটে নিজ দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেন। শিল্পকর্মটি দর্শনার্থীদের দুই দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও সেই স্বপ্নযাত্রায় দুই মহান নেতার আত্মত্যাগের মধ্যে অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য তুলে ধরেছে।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রিজাল জাদুঘরে জাতির পিতার ওপর দুই মাসব্যাপী এক প্রদর্শনী শুরু হয়, যেখানে জাতির পিতার আত্মজীবনী, তাঁর ওপর রচিত বিখ্যাত বই, ঐতিহাসিক ছবিসহ অন্যান্য চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়।

শিল্পী নিকোলাস জানান, ২০১৮ সালে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ভ্রমণ করার পর হোসে রিজাল ও বঙ্গবন্ধুর জীবনের মধ্যে তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পান- যা তাকে এই শিল্পকর্মটি সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

প্রতিবেদন: উষা রানি রায়

---

2 https://bdnewshour24.com/main/newsDetails/69232

পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল বাংলাদেশ

সুস্মিতা চৌধুরী

পাখি পরিযান বলতে নির্দিষ্ট প্রজাতির কিছু পাখির প্রতিবছর বা কয়েক বছর পর পর একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে বা সময়ে কম করে দুটি অঞ্চলের মধ্যে আসা-যাওয়াকেই বোঝায়। জীবজন্তুর ক্ষেত্রে মাইগ্রেশনের সঠিক পরিভাষা হচ্ছে সাংবাৎসরিক পরিযান। যেসব প্রজাতির পাখি পরিযানে অংশ নেয়, তাদেরকে পরিযায়ী পাখি বলে। এ পাখিরা প্রায় প্রতিবছর পৃথিবীর কোনো এক বা একাধিক দেশ বা অঞ্চল থেকে বিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চলে চলে যায় কোনো একটি বিশেষ ঋতুতে। সে ঋতু শেষে পরিযায়ী পাখিরা আবার ফিরে যায় যেখান থেকে এসেছিল সেখানে। এমন আসা-যাওয়া কখনো এক বছরে সীমিত থাকে না। এ ঘটনা ঘটতে থাকে প্রতিবছর এবং কমবেশি একই সময়ে।

পাখি পরিযানের অন্যতম দুটি কারণ হচ্ছে– খাদ্যের সহজলভ্যতা আর বংশবৃদ্ধি। উত্তর গোলার্ধের অধিকাংশ পরিযায়ী পাখি বসন্তকালে উত্তরে আসে অত্যধিক পোকামাকড় আর নতুন জন্ম নেওয়া উদ্ভিদ ও উদ্ভিদাংশ খাওয়ার লোভে। এসময় খাদ্যের প্রাচুর্যের কারণে এরা বাসা করে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। শীতকালে বা অন্য যে-কোনো সময়ে খাবারের অভাব দেখা দিলে এরা দক্ষিণে রওনা হয়। আবহাওয়াকে পাখি পরিযানের অন্য আরেকটি কারণ হিসেবে ধরা হয়। শীতের প্রকোপে অনেক পাখিই পরিযায়ী হয়। হামিংবার্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে খাবারের প্রাচুর্য থাকলে প্রচণ্ড শীতেও এরা বাসস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে যায় না।

বিশ্বের অসংখ্য দেশের মধ্যে পরিযায়ী পাখির জন্য সুন্দর আবাসস্থল হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি নদনদী, হাওর-বাঁওড়, বিলঝিলে এসব পাখিদের বিচরণ লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্টদের মত অনুযায়ী, পাখির উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করেছে। কেননা এরা স্বল্পকালের জন্য হলেও আমাদের প্রকৃতিতে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সার্বিক পরিবেশকে নতুন রূপদান করে। পাখির সৌন্দর্য, কলতান, পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো আদিকাল থেকেই মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে আসছে। বাংলাদেশের যে কয়টি স্থানে পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে সেসব স্থানে পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল ও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল ও জলাভূমির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাইক্কার বিল। এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকি পরিযায়ী পাখির এক নম্বর আবাসস্থল। সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, নীলফামারী জেলার নীলসাগর, ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্যান, মিরপুর সিরামিক লেক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জলাশয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পুটিয়ার পচামাড়িয়া, সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওর, দিনাজপুরের রামসাগর, বরিশালের দুর্গাসাগর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে ৬ শতাধিক প্রজাতির পাখি রয়েছে, যার মধ্যে ২০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। জানা যায় যে, ইউরেশিয়ায় ৩০০ প্রজাতির বেশি প্রজননকারী পাখির এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া– যা আফ্রিকায় পরিযান করে। এসব পাখির এক-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশে সাইবেরিয়া থেকে বেশি সংখ্যক পাখি আসে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসে হিমালয় ও উত্তর এশিয়া থেকে। বাংলাদেশ ১২ ও ১৩ই মে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস বা ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেনড বার্ড ডে হিসেবে পালন করে থাকে, যা আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছরই সারা বিশ্বে ৯ থেকে ১০ই মে পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করা হয়। ২০১৫ সালেও ৯-১০ই মে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করেছেন আমাদের পাখিবিদরা। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ১০ ও ১১ই মে দিন দুটিকে নির্ধারণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে মূলত শীতকালে পরিযায়ী পাখি আসে। মে মাসে খুব একটা পাখি আসে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা পরিযায়ী পাখি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্বের নানা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০১৬ সাল থেকে ১৮ই অক্টোবর দিনটি পালনের প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরের পরিবেশবাদীরা সমর্থন করে।

২০১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর ইউনিসেফ সিদ্ধান্ত নেয়, বছরের যে-কোনো সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে যে এলাকায় পরিযায়ী পাখি আসে তখনই কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে। ২০১৮ সালে দুই দিন প্রচারণা ধার্য করার বিষয়টি ছাড়াও বিশেষত্ব হচ্ছে, সারা বিশ্ব একযোগে উদ্‌যাপন করেছে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস বা ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেনড বার্ড ডে। ২০১৮ সালের প্রচারণায় বিশ্বায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই অর্জনের অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ। গত এক যুগ ধরে পরিযায়ী পাখি গবেষণায় বাংলাদেশ অনেক সফল হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কনজারভেশন ফর নেচার (আইইউসিএন) ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারির তথ্য মতে, গত পাঁচ বছর দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা গড়ে ৮৫ হাজার বেড়েছে। বাংলাদেশ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flyway Partnership)-এর সদস্য হয়েছে এবং ৫টি এলাকাকে Flyway site ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে রয়েছে টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ। এ সকল এলাকায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়ার্ল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation প্রদান করা হচ্ছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকাকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় Ecological Critical Area ঘোষণা করেছে। এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ বেড়েছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে প্রায় ৭৫০০ পাখি উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে বলে বন অধিদপ্তরের সূত্র থেকে জানা যায়।

পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর সেক্ষেত্রে পরিযায়ী পাখি হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের দূত। বিশ্বের তাবৎ বন্যপ্রাণীর মধ্যে পাখিকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ এরা ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে, পরাগায়নের মাধ্যমে, বীজ স্থানান্তর করে, ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্য উচ্ছিষ্ট খেয়ে, এমনকি প্রতিবেশ সূচক হিসেবে খাদ্য-শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে আমাদের উপকার করে থাকে। তাই এদের সংরক্ষণ করা অতি জরুরি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

নিরাপদ মাতৃত্ব এবং করোনা ঝুঁকি

সামিরা আলম

একজন নারীর জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয় 'মা' হওয়ার পর। নারীর জীবনের পূর্ণতা আসে সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। সন্তানের হাসিতে খুঁজে পান তিনি পৃথিবীর সকল সুখ, অনাবিল আনন্দ। বস্তুত মায়ের সুস্থতার ওপর নির্ভর করে সন্তানের নিরাপদ জন্ম ও সুস্থ জীবন। তাই মায়ের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মা ও শিশুমৃত্যু রোধ এবং তাদের অসুস্থতার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করার পাশাপাশি এসব সমস্যা প্রতিরোধ করার প্রত্যয়ে ১৯৮৭ সাল থেকে ২৮শে মে সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযথ ভাবে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হয়। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান সম্পর্কে মা, পরিবার ও সমাজের সকলের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করাই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

নিরাপদ মাতৃত্ব হলো সকল মায়ের অধিকার। মায়ের চাওয়া অনুযায়ী গর্ভধারণ, গর্ভকালীন সেবা, নিরাপদ প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত হওয়া। গর্ভকালীন জটিলতা, দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা দানকারীর অনুপস্থিতি, প্রয়োজনীয় যত্নের অভাব, এ বিষয়ে পরিবারের অসচেতনতা, অবহেলা, প্রসব-পরবর্তী সেবার অদূরদর্শিতায় একজন মা তার প্রাপ্য ন্যূনতম এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। আবার অসংখ্য পরিবারকে দেখা যায়, যারা অজ্ঞতা, বিভ্রান্তির কারণে চিকিৎসা সেবা নিতে আগ্রহী নয়। ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন গর্ভবতী নারীরা। নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি কর্মজীবী মায়েদের জন্য আরো ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়া সিজারিয়ান পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা মাতৃস্বাস্থ্যের জন্য অনেকাংশেই হুমকিস্বরূপ। বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শিশু জন্ম নিচ্ছে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে। অথচ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে সিজার হওয়া উচিত সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ।

একজন গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ প্রসব এবং প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা গর্ভবতীর স্বামীসহ পরিবারের সকলের সমান দায়িত্ব। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে গর্ভধারণের পরপরই একজন গর্ভবতী নারীর গর্ভকালীন যত্নের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে অথবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। সাধারণত একজন গর্ভবতীকে ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার, ৩৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ১৫ দিনে একবার এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। একজন গর্ভবতীকে অবশ্যই টিটি টিকা নিতে হবে এবং মা ও শিশু উভয়ের সুস্থতার জন্য একটু বেশি পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। বিশেষ করে গর্ভের সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য আমিষ জাতীয় খাবার যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ও দুধ বেশি করে খেতে হবে। এছাড়া সবুজ, রঙিন শাকসবজি, ফল ও যেসব খাবারে আয়রন বেশি আছে যেমন– কাঁচাকলা, পালংশাক, কচু, কচুশাক, কলিজা ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খেতে হবে এবং রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে। অনেকেরই ধারণা মা বেশি খেলে পেটের বাচ্চা বড়ো হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক প্রসব হবে না। কিন্তু এই ধারণা মোটেও সঠিক নয় বরং মা বেশি খেলে মা ও গর্ভের বাচ্চা উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মা প্রসবের ধকল সহ্য করার মতো শক্তি পায় এবং মায়ের বুকে বেশি দুধ তৈরি হয়।

করোনাকালে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছেন গর্ভবতী নারীরা। তাই করোনাকালে গর্ভবতী নারীদের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। বিশেষজ্ঞদের মতে– স্বাভাবিকভাবেই অন্তঃসত্ত্বা নারীরা একটু বেশি সংবেদনশীল থাকে অর্থাৎ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর করোনা যেহেতু সংক্রামক রোগ তাই গর্ভবতী নারীরও সংক্রমিত হওয়ার শঙ্কা থাকে। আর তার যদি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হাঁপানি থাকে তাহলে তার ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। আবার এই মায়েরা গর্ভকালীন বা প্রসবকালীন সময়ে আরো ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছেন কোভিড, নন-কোভিড হাসপাতালের চক্করে পড়ে। আবার গর্ভাবস্থায় নারীদের বেশ কিছু শারীরিক পরিবর্তন হয়, যার ফলে গর্ভবতী নারীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য গর্ভবতী নারীদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হলে তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সঙ্গে চিকিৎসা করা উচিত।

অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই গর্ভবতী নারীদের জন্যও সংক্রমণ এড়াতে একই প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– যদি হাঁচি-কাশি হয় এমন কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়ানো, বার বার সাবান পানি বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখ এবং নাককে টিস্যু দিয়ে ঢেকে রাখা বা কনুই ব্যবহার করা এবং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি পুরোপুরি সিদ্ধ করে রান্না করে খাওয়া। এসকল যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে WHO ওয়েবসাইটে।

মাতৃমৃত্যু কমাতে মিডওয়াইফ বা ধাত্রীদেরকে 'পিলার' হিসেবে গণ্য করা হয়। গত কয়েক বছর ধরেই বর্তমান সরকার মিডওয়াইফের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং জরুরি প্রসব সেবাসহ প্রসবকালীন জটিলতায় সঠিক রেফারেল সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল (২০১৯ থেকে ২০৩০) অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৪৭.১% থেকে ৮৫%-এ উন্নীত করা এবং দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের হার ৫০% থেকে ৯০%-এ উন্নীত করা হবে। পাশাপাশি এ কৌশলের আরো একটি লক্ষ্য হচ্ছে মাতৃ মৃত্যু হার ১৭২ থেকে ৭০-এ হ্রাস করা (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে) এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার ১৭ থেকে ১২-তে কমিয়ে আনা। এছাড়া গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে চারবার গর্ভকালীন সেবা গ্রহণের হার ৩৭.২% থেকে ১০০%-এ উন্নীত করা। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মিডওয়াইফদের সক্ষমতা বাড়ানো, মাতৃস্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি, নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মেরিস্টোপস বাংলাদেশ, ইউএনএফপিএ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন এনজিও এবং দাতা সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

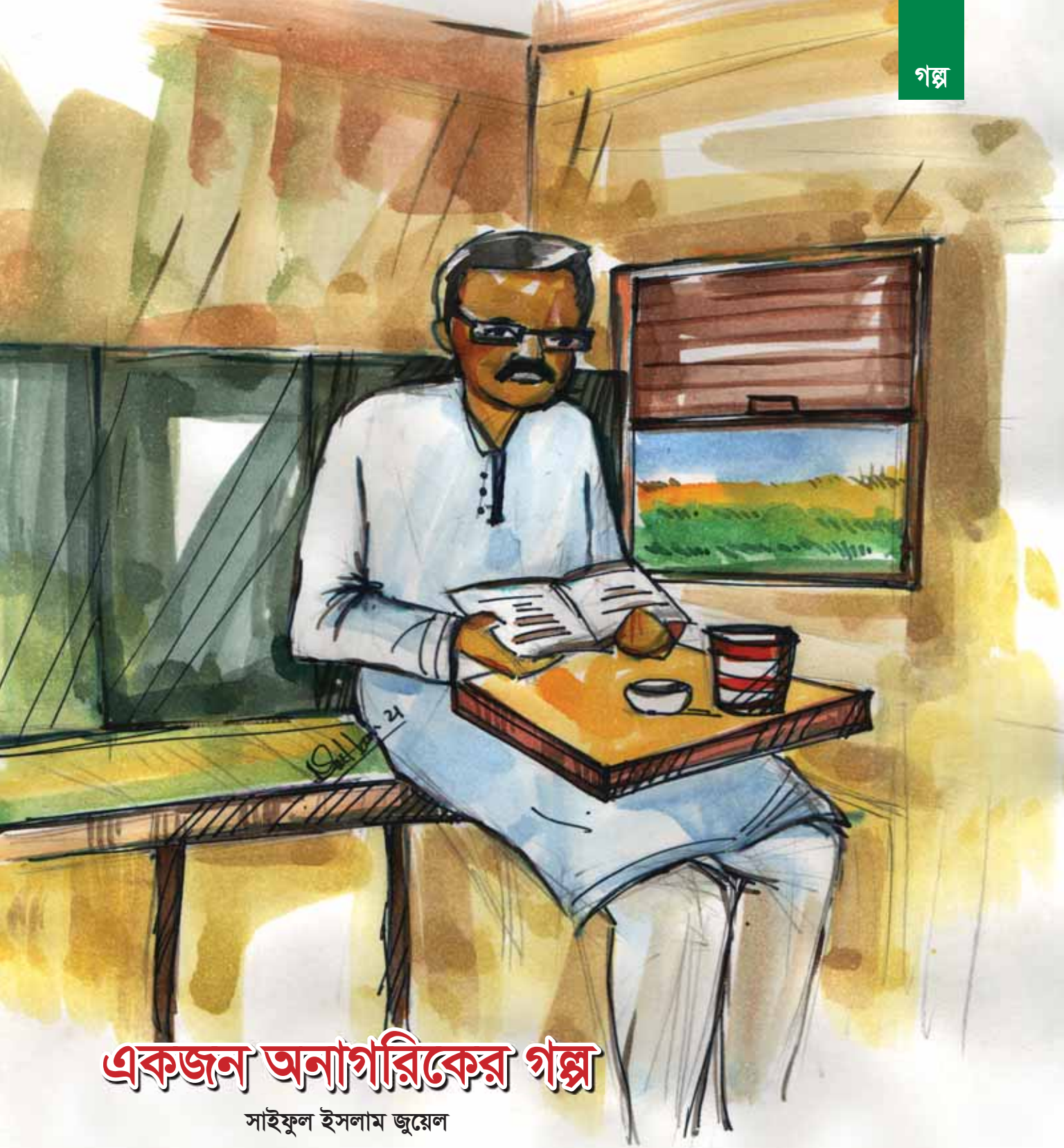

একজন অনাগরিকের গল্প

সাইফুল ইসলাম জুয়েল

লোকটিকে প্রায়ই চোরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখি। আমি তার দিকে তাকানো মাত্রই চোখ ফিরিয়ে নেন। 'এই লোকটা আমার দিকে কী দেখছেন?'– নিজের মনেই প্রশ্ন করি। 'কোনো বদ মতলব নেই তো?' এমন সাধু-সন্ন্যাসীদের দেশে চোর-বদমাশ থাকাটা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। কিন্তু লোকটির বয়সের দিকে তাকালে তাকে টাউট-বাটপার কিছু ভাবার বিষয়টা মাথায় থাকে না। বয়স পঁচাত্তর থেকে আশির মাঝামাঝি হবে। নড়নচড়নে পিঁপড়ের গতি। দু'বার আমার পিছু পিছু এসে কেবল একটাই প্রশ্ন করেছেন– 'বাবু কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?' আমি 'হ্যাঁ' বলার পরে আরো কিছু বলার জন্য ইতস্তত করেছেন, কিন্তু বলতে পারেননি।

এসেছি 'ঘাটশিলা' নামক এক অনিন্দ্য সুন্দর জায়গায়। এটা ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশের মধ্যে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের

হাওড়া থেকে ইস্পাত এক্সপ্রেসে সোজা ঘাটশিলায়। হোটেল বিভূতিবিহারে উঠেছি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে *পথের পাঁচালী*'র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজরিত এই ঘাটশিলা। এই সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বসেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। সময়টা বর্ষার শেষাশেষি। পাথরের বাধা অতিক্রম করে দুরন্ত বেগে এগিয়ে গেছে নদীটি। সুবর্ণরেখার রূপ দেখে পুরোপুরি মুগ্ধ হলাম। প্রথম দিনটি এখানেই কাটালাম। পরের দিন গেলাম যদুগোড়ার কাছে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখতে। আর সেখানেই পরিচয় ঐ বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে। মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলাম, আড্ডা মানে– এই মন্দিরের ইতিহাস, এখানকার মানুষের কথা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলাম। আমি বাংলাদেশ থেকে তাদের এই মন্দিরটা দেখতে এসেছি শুনে পুরোহিত মশাই অনেক খুশি হয়ে আমাকে যথাসম্ভব গুছিয়ে সবকিছু বর্ণনা করলেন। প্রথমে খেয়াল করিনি, কিন্তু পরে মনে পড়েছে– ঐ বৃদ্ধ লোকটিও তখন মন্দিরের ভেতরে আমাদের অদূরেই বসেছিলেন। আমাদের দুজনার আলাপ-আলোচনা শুনছিলেন কি-না কে জানে!

যদুগোড়া জায়গাটা অনেক সুন্দর। এ কারণে ঘাটশিলা থেকে প্রতিদিনই এখানে এসে একটা চক্কর মেরে যাই। প্রতিবারই লক্ষ করতাম, আমাকে দেখামাত্রই বৃদ্ধের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সারাটা সময় আমাকে চোরা চোখে দেখতেন। আর ফেরার সময় বিমর্ষ নয়নে তাকিয়ে থাকতেন।

একদিন গেলাম ঘাটশিলা থেকে যদুগোড়ার বিপরীত দিকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরের গ্যালুডি ড্যামে। পরের দিন গেলাম ঘাটশিলা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরের বুরুডি লেক দেখতে। ছবির মতো সুন্দর এই লেকটি। এখানে সূর্যাস্ত দেখে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে একটা রাত কাটালাম। তিনদিন পরে আবারো যদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরে গেলাম। এখান থেকেই বাড়ি ফেরার পথ ধরব। কিন্তু মন্দিরে গিয়ে দেখি সেই রহস্যময় বৃদ্ধ লোকটি নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কেন যেন বৃদ্ধের অব্যক্ত কথাগুলো শুনতে খুব ইচ্ছে করছিল। সর্বশেষ যেদিন তাকে দেখি, খুব অসুস্থ মনে হয়েছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু বৃদ্ধের দেখা নেই। এখন না ফিরলে হোটেলে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে ট্রেন ধরা সম্ভব হবে না। পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলাম– 'আজ ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে দেখেছেন?'

এই মন্দিরে বৃদ্ধ ঐ একটি লোকই নিয়মিত আসেন, পুরোহিত তাকে চিনতে পারলেন। জানালেন, গত দুদিন ধরে বৃদ্ধকে তিনি এখানে আসতে দেখেননি। জানতে পারলাম, ফুলডুংরি পাহাড়ের পাদদেশে একটা ছিন্নমূলদের গ্রাম আছে। বৃদ্ধ সেই গ্রাম থেকে এখানে আসেন। যাই হোক, বৃদ্ধের সঙ্গে কথা না বলে বাড়ি ফিরব না– এই ভাবনা থেকেই রাতটা মন্দিরে থেকে গেলাম। গ্রাম থেকে পুরোহিতের জন্য পাঠানো খাবার দুজনে ভাগাভাগি করে খেলাম।

পরদিন খুব সকালে বের হলাম ফুলডুংরি পাহাড়ের উদ্দেশে। পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস নাই, তাই গিরিখাদ বেয়ে নিচে নামতে সাহস হলো না। ভাবলাম, বৃদ্ধ যেহেতু নিয়মিত মন্দিরে যান, সুতরাং অন্য কোনো সহজ রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। কিছুদূর যেতেই পাহাড়ের গা কেটে বানানো একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। বুঝলাম, নিজেদের প্রয়োজনেই এ পথ তৈরি করেছে স্থানীয় লোকগুলো। নিচে নেমে এক আশ্চর্য জগৎ চোখে পড়ল। অল্প একটু জায়গার ভেতরেই ছোটো ছোটো অনেকগুলো ঘর। খোদার পৃথিবীতে ওদের থাকার জায়গার যেন বড়োই অভাব। ভেড়া, গরু আর মুরগি পালে এরা। বৃদ্ধ লোকটির নামধাম কিচ্ছু জানি না। স্থানীয় লোকদের বর্ণনা দেওয়ার পরে তারা বললেন, অমন কেউ তাদের গ্রামে থাকেন না। এখান থেকে বনের আরো ভেতরের দিকে এক বৃদ্ধ লোক থাকেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পারি।

বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে অনেকটা দূর এগিয়ে গেলাম। একটা ছোটো নদী পড়ল, হেঁটেই পাড়ি দেওয়া যায়। ওপাড়ে গিয়ে কিছুদূর হাঁটার পর একটা প্রায় পরিত্যক্ত কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে চললাম। কেন যেন বুকটা ধকধক করতে লাগল। দরজা ভেতরের দিকে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল।

রুমের ভেতরটা অন্ধকার। এদিক-ওদিক তাকালাম, গাঢ় অন্ধকারে কাউকে চোখে পড়ল না। হঠাৎ একটা কাশির শব্দে চমকে উঠলাম। একটা জানালা খুলে দিতেই অন্ধকার উধাও। একটা পুরনো চৌকির ওপরে কাঁথা পেঁচিয়ে এক বৃদ্ধকে শুয়ে থাকতে দেখলাম।

'জানতাম তুমি আসবে। মাটির গন্ধ ঠিকই স্বজাতিকে চিনিয়ে দেয়।' আমার দিকে পাশ না ফিরেই বললেন তিনি। কিন্তু আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলাম না। 'এই চৌকিটার ওপরেই সাবধানে বসে পড়। সব জানতে পারবে। আমি জানতাম– আমার কথা শোনানোর জন্য ভগবান নিশ্চয়ই এমন একজনকে পাঠাবেন!'–বলেই তিনি আবার খুকখুক করে কাশতে লাগলেন। 'তোমাকে বেশি জ্বালাবো না। কেবল একটা অনুরোধ আর কয়েকটা কথা বলব। দয়া করে মন দিয়ে শোনো।'– আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি বলতে লাগলেন 'বাড়িটার পেছনে একটা খোয়াড় আছে। সেখানে অনেকগুলো হাঁস-মুরগি আর বিশটা ছাগল আর বারোটা গরু আছে। দুটো ভেড়াও আছে। তুমি ভেড়া দুটো তোমার আসার পথে যে গ্রামটা দেখে এসেছ, ওখানকার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেবে। আর গরু-ছাগল-মুরগিগুলো ওই মন্দির আর গ্রামবাসীর মধ্যে বিলিয়ে দেবে। ভেড়া বিক্রির টাকা দিয়ে গ্রামবাসীকে দিয়ে আমার শেষকৃত্য করাবে। তবে হ্যাঁ, আমার কুণ্ডলিটা তোমার সাথে নিয়ে নেবে।'

'কিন্তু...', আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমাকে তো আজই চলে যেতে হবে। এখানে এসেছি অনেক দিন হয়ে গেছে। এ কাজ আমার পরিবর্তে এখানকার কাউকে দিয়ে করালেই তো পারতেন!

কিন্তু তিনি আমাকে এ কথা বলার সুযোগ দিলেন না। 'এক গ্লাস পানি দাও, জলদি। হে ভগবান, আর দুটো মিনিট কথা বলার শক্তি দাও আমাকে...।'

আমি তাড়াতাড়ি পানি এনে দিলাম। এই ফাঁকে বৃদ্ধ তার বালিশের নিচ থেকে একটা জীর্ণ ডায়েরি বের করে হাত দিয়ে সেটা মুছে কয়েকবার চুমু খেতে খেতে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি ইতস্তত ডায়েরিটা হাতে নেওয়ার পর তিনি বললেন, 'এটা আমার যক্ষের ধন। এতটা বছর নিজের কাছে আগলে রেখেছি। এবার তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। একটু কষ্ট করে পড়ে দেখবে। তোমার সব উত্তর পেয়ে যাবে। বিদায় বন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।'– বলতে বলতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

বৃদ্ধের কথামতো সবকিছু করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। অচেনা, অজানা হলেও চোখের সামনে বৃদ্ধ লোকটিকে মারা যেতে দেখে ভীষণ কষ্ট পেলাম। সেদিন রাতেই ট্রেনে কলকাতার পথ ধরলাম। ভীষণ ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধের দেওয়া ডায়েরিটা খুলে ট্রেনের কামরায় পড়তে শুরু করলাম। যেন প্রবেশ করলাম এক নতুন

জগতে। অজানা অভাবিত অনেক বিষয়ের মুখোমুখি হলাম। বৃদ্ধের ডায়েরিটা পড়তে আমার সময় লেগেছিল পুরো তেরো ঘণ্টা। নাওয়া-খাওয়া সবকিছু ভুলে একটানা ডায়েরিটা পড়ে শেষ করে তবেই উঠেছি। পুরোটা এখানে উল্লেখ করব না। ভবিষ্যতে বৃদ্ধের নামে একটা বই বের করার ইচ্ছে আছে আমার। পাঠকের জ্ঞাতার্থে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে না ধরে মূল অংশটুকু তুলে ধরছি এখানে।

দুই.

২১.১১.২০১৩

সূচনা লিখব বলে এ জায়গাটুকু ফাঁকা রেখেছিলাম। এতদিন পরে সেটা পূরণ করছি। আমি ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশের এক অচেনা দুর্গম স্থানে বসে লিখছি আমার এ স্মৃতিকথা। লেখাটা শুরু করেছি আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর পূর্বে, তখন আমি বাংলাদেশে থাকতাম। টানা দশ বছর লিখে অতীতটাকে লিপিবদ্ধ করেছি। তারপর কালের বর্তমানের টুকিটাকি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এখানে আমার কোনো নাম নাই। যার দেশ নাই তার নামেরই বা কী দরকার। তবে, কাহিনির প্রয়োজনেই স্বীকার করতে হচ্ছে, আমি সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। ভারতে বাস করি আমি। কিন্তু আমি ভারতের নাগরিকত্ব নেইনি। যেখানে জন্মেছি, যাকে ভালোবেসেছি, সেটাই আমার দেশ। সেই দেশটাই যখন আমাকে তার নাগরিক হয়ে থাকতে দিল না, পরের দেশে তাই নাগরিক হওয়ার কোনো আশাও রাখি না আমি। আর তাইতো এত বছর পরেও আমি এই ভারত নামক দেশটার একজন অ-নাগরিক। লোকসমাজ থেকে অনেক দূরে থাকি আমি। স্ত্রী মারা গেছে। কীভাবে, সেটা এই কাহিনিতে উল্লেখ করা আছে। এতটা বছর বড়ো একাকিত্বে কেটেছে আমার। ভুল বলেছি, কিছু অবুঝ পশু আর এই ডায়েরিটা আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। নাগরিকত্ব না থাকায় এখানকার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে আমাকে। সব থেকে আফসোসের বিষয়টা হলো– আমি আমার জন্মভূমির বুকে ঘুমাতে পারিনি এতদিন। এর থেকে বড়ো কষ্ট আর কী আছে। মৃত্যুর পর আমার কুণ্ডলিটাও কি আমার দেশের মাটিতে জায়গা পাবে না? নিয়তির কাছে এই প্রশ্নটা রেখে যাচ্ছি। সত্যিই যদি আমি দেশ মায়ের সন্তান হয়ে থাকি, তাহলে আমার শেষ ইচ্ছেটা যেন পূরণ হয়। নতুবা এই দেশেই পঁচে-গলে যেন শিয়াল-কুকুরের খাবার হয়ে যাই আমি। হে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ, তোমার এই সন্তানটার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাও...

ছিয়াত্তর থেকে পঁচাশি টানা দশ বছরে লেখা ডায়েরির প্রথম অংশ:

এতটা বছরে যে কী পরিমাণ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার তা এক কথায় অবর্ণনীয়। তবে অল্প অল্প করে তা এখানে বর্ণনা করে যাব। আমার জন্ম বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে, এই শতকের সাইত্রিশ সালে। ছোটোবেলা থেকেই গ্রামের ধুলো-ময়লা মেখে বড়ো হয়েছি আমি। কখনো ভাবিনি যে এই মাটির বুক থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে! তখন মাত্র দশ বছর বয়স আমার। ১৯৪৭-এর দেশভাগের শিকার হলাম আমরা। বাপ-দাদার ধর্মের কারণে দেশছাড়া করা হলো আমাদের। এখনো আমার বন্ধু শফিকের (ছদ্মনাম) মুখটা খুব মনে পড়ে। যাবার সময় ওর আর আমার কান্নাটা কারো মন গলাতে পারেনি, ভাঙতে পারেনি ধর্মীয় শাসকদের শিকল। আমার বাবার অনেক জায়গা-জমি ছিল, অথচ আমরা তার ছিটেফোঁটাও নিয়ে যেতে পারিনি। অচেনা একটি দেশে এসে ভিখিরির মতো ঘুর ঘুর করেছি আর কুকুরের মতো এর-ওর লাথি-গুঁতো খেয়েছি। কষ্ট সহ্য না করতে পেরে মা বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন। বাবা গেলেন ষাটের দশকে। এতদিন ওখানে কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেছি তা অবর্ণনীয়। তারপরেও দু-একটা ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়...।

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। বড়ো আফসোস পরের দেশে যখন ছিলাম তখন এই দিনটা কীভাবে যে কেটে যেত টেরই পেতাম না। আজ শহিদমিনারে ফুল দিতে গিয়ে মনে পড়ল– ভাষা আন্দোলনের কথা জানতে পেরেছিলাম পাঁচ কী সাত বছর পরে!

বাবার মৃত্যুর পর দেশে ফেরার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল। সত্তর সালের প্রথমদিকে একদিন সীমান্ত দিয়ে গোপনে দেশে ঢুকে পড়লাম। প্রথমেই দেশের কাদামাটি সারা গায়ে মেখে নিলাম। কয়েকদিন লেগে গেল বাবার ভিটেটা খুঁজে পেতে। ওটা এখন সরকারের সম্পত্তি হয়ে গেছে! অনেক কষ্টে শফিককে খুঁজে পেলাম। ও এখন সেনাবাহিনীর বড়ো অফিসার। ওর বাবা মারা গেছেন। আমাকে ফিরে পেয়ে সে কী আনন্দ ওর। আমার দুঃখের কথা শুনে বলল– 'দুঃখ করিস না বন্ধু, যে ধর্মীয় বিভেদ তোকে আর আমাকে আলাদা করে রেখেছিল এতদিন, সেই দূরত্বটা দূর করে দেব আমি। তুই হিন্দু, আমি মুসলমান। আমার বোনকে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব। তবে শর্ত একটাই– মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কিছু যেন তোদেরকে আলাদা করতে না পারে।' শফিক ঢাকায় থাকত। সেখানেই ও আমাকে একটা ব্যাবসা ধরিয়ে দিল। সবাই মিলে ঢাকায় থাকতে শুরু করলাম। নতুন জীবন, নতুন সংসার, পুরনো দেশ– সবকিছু মিলিয়ে ভালোই দিন কেটে যাচ্ছিল। শফিকের সাথে বড়ো বড়ো নেতাদের ওঠাবসা ছিল, নিয়মিত কথা হতো। তার সবই ও বিশ্বাস করে আমাকে বলত।

এরই মধ্যে একদিন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শফিক আগেই অনুমান করতে পেরেছিল। তাই আমার বউ আর শাশুড়িকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ও আর আমি এক সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়লাম। ওর ট্রেনিং ছিল, ও আমাকে রণকৌশল শেখাল। যুদ্ধের এক পর্যায় আমি ওকে একটা বড়ো বিপদ থেকে বাঁচালাম। দুজনেই যুদ্ধ শেষে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। কাউকে পেলাম না। শুনলাম–

হায়েনারা দুজনকেই মেরে ফেলে রেখে গেছে। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ লাশ দুটি শেয়াল-কুকুর যাতে না খেতে পারে, সেজন্য কোনোভাবে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাকে নতুনভাবে গড়ার স্বপ্ন দেখলাম আমি। ধীরে ধীরে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকেই এগোতে লাগল দেশ। তারপর হঠাৎই স্বপ্ন ভঙ্গ। আমাদের মুক্তির অগ্রপথিককে সপরিবারে মেরে ফেলল কিছু দুর্বৃত্তরা। শফিক অনেক কিছুই জানত, সব কিছুই ও বলেছে আমাকে। মুজিবকে মারার পরে মনটা বিষিয়ে উঠল। তারপর সেনা শাসন আর জেলে চার নেতাকে হত্যা করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারিনি আমি। যাঁরা দেশটাকে স্বাধীন করতে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করল, তাঁরাই নেই! তাহলে আমিই বা এখানে থেকে কী করব– এই ভাবনা থেকেই একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম...।

ছিয়াত্তরে ভারতে আসার পর থেকে মৃত্যুর আগের কাহিনি আছে ডায়েরির শেষাংশে :

সীমান্ত রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে এলাম। প্রথমে কিছুদিন কলকাতায় থেকেছি। বাংলাদেশ ছেড়ে এলেও দেশের খোঁজখবর নিয়েছি নিয়মিত। খুব দ্রুতই দেশের পটভূমি পরিবর্তন হতে দেখলাম। নেতৃত্ব মানুষকে পশু বানিয়ে দেশটাকে বানিয়ে দিল ধ্বংসস্তূপ। ঐক্য থাকলে দেশটা এতদিনে অনেক এগিয়ে যেত। পাকিস্তানি সেনা শাসকদের থেকে হাত বদল হয়ে এবার দেশীয় সেনা শাসকদের শাসন শুরু হলো দেশে! এও কি ভাবা যায়...।

এরমধ্যে আরকেটি ঘটনা ঘটে গেল। কলকাতায় শফিক আমাকে নিয়মিত চিঠি পাঠাত। অভ্যন্তরীণ যা কিছু জানত ও, তার সবকিছুই আমাকে লিখে জানাত। আমি আলাদা একটা কাগজে সেগুলোর ছোট্ট একটা নোট/তালিকা তৈরি করেছি। ওকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম– 'তুমি তো সবই জানো, তারপরেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছ না কেন?' জবাবে শফিক জানাল– 'সবকিছু জানলেও প্রতিবাদ করতে গেলে মরণ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। সময় অনুকূলে এলে অনেক কিছুই করা যাবে। সবকিছুর বদলাও নেওয়া যাবে তখন।' সে যাই হোক, একদিন খবর শুনি– ও কোনো এক অপারেশনে অংশ নিতে গিয়ে মারা গেছে! আসলে ওকে যে মেরে ফেলা হয়েছে সেটা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হলো না আমার। শফিক আমার পৈতৃক সম্পত্তি সরকারের কাছ থেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে সফল হয়নি ও।

মনের দুঃখে ভবঘুরে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভারতের এ অঞ্চলেতে এসে পড়ি। এখানেই আমৃত্যু থাকবার চিন্তা করি। সেই লক্ষ্যে গ্রাম থেকে দূরের এ জঙ্গলে একটা কুঁড়েঘর বানাই। পাশাপাশি এখানে আমার খাবারের নিরাপত্তায় পশুপালন শুরু করি। আশির দশকের শুরু থেকে এখানে আছি। ধীরে ধীরে অনেক কাহিনিবহুল দিন কেটে যেতে লাগল...

কয়েকদিন ধরে মৃত্যুভয়টা খুব করে পেয়ে বসেছে আমাকে। বুঝতে পেরেছি, আমার কাছে যমদূতের আসতে আর বেশিদিন বাকি নেই। দেশের এতটা দূরে থেকে এতদিনে একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি– দেশপ্রেম কাকে বলে। তাই আবারো ফিরে যেতে চাইছি দেশের বুকে। কিন্তু এ বয়সে সীমান্ত ফাঁকি দেওয়াও যে অসম্ভব। তাছাড়া এদেশের নাগরিকত্ব নেইনি। ধরা পড়ে গেলে জেলেই কাটাতে হবে। তাই একটা শেষ প্রচেষ্টা– নিজে না গেলেও অন্তত মৃত্যুর পর যাতে আমার কুণ্ডুলিটা দেশের মাটিতে জায়গা পায়!

কয়েকটা বছর ওই মন্দিরে বসে অপেক্ষা করেছি– স্বদেশের কেউ না কেউ যেন এখানে আসে। এতদিনে ভগবান আমার কথা শুনলেন। একটা ছেলেকে এখানে দেখলাম, বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছে। ওর গায়ের ঘ্রাণ শুকে আমি আমার প্রিয় বাংলাদেশের ঘ্রাণ পাই। ওকে আমার গল্প বলব। আচ্ছা, ও কী আমায় বিশ্বাস করবে? স্বাধীনতার সময় আমাদের জনগোষ্ঠীরই একটা ক্ষুদ্র অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। ও আবার সেই দলের নয় তো? সবকিছু ভগবানের হাতে ছেড়ে দিলাম। তিনি যা করার করবেন...

তিন.

অনেক সংক্ষেপ করে বৃদ্ধের ডায়েরির কথাগুলো তুলে ধরলাম এখানে। তিনি সত্য লিখেছেন, নাকি মিথ্যে লিখেছেন, নাকি নিছকই একটা গল্প লিখেছেন– তার বিচারের ভার পাঠকের হাতেই তুলে দিচ্ছি। প্লেনে যেদিন ঢাকায় ফিরলাম, নিজের অজান্তেই হাতে করে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে আমার সারা শরীরে মেখে নিলাম। বাংলাদেশকে যেন নতুন করে দেখবার জন্য এক জোড়া বন্ধ চোখ হঠাৎ করেই খুলে গেল। বাংলার যা দেখি তাতেই মুগ্ধতা বাড়তে লাগল। আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে বৃদ্ধের কুণ্ডুলিটা মাটিচাপা দিয়ে রাখলাম। বৃদ্ধকে আমার পরিবারের বাইরের একজন ভাবতে পারলাম না।

ট্রেনে ঘাটশিলা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বৃদ্ধের ডায়েরির ভেতর থেকে একটা আলগা কাগজ বের হয়ে বাতাসে জানালা দিয়ে বাইরে উড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও ওটাকে আর ধরতে পারিনি। কাগজটায় কী লেখা ছিল জানি না। তবে বৃদ্ধের লেখায় তার কিছুটা ইঙ্গিত হয়ত ছিল। তবে আদৌ তা-ই ছিল কি-না কে জানে! কাগজটা উড়ে যাবার মতো করেই হয়ত এতদিনে আমাদের অনেক স্বপ্নও উড়ে গিয়ে কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে...।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে

আসলাম সানী

পৃথিবীর দেশে-দেশে-মহাদেশে
কালে-কালে মহাকালে
তুমি আসো–
মানুষের সুখ-স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা
শান্তি আর মুক্তির বারতা নিয়ে
মানবতার মঙ্গল ও কল্যাণে–
তুমি আসো– হে মহার্ঘ্য
বিশ্ব কবিতার গানে-গানে, প্রাণে প্রাণে
'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা...'
তুমিই তো পুণ্য পরিপূর্ণ হে জ্যোতির্ময়
সাতই মার্চের মহাকাব্য
'এবারের সংগ্রাম–কালজয়ী
আরাধ্য উপাসনায় বাঙালিক্ষণ,
ছাব্বিশ মার্চ লাল-সবুজে উত্তাল-উদ্যম-উচ্ছল
বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ–আঙুলি হেলনে তুমি আসো–
বিদ্রোহী নজরুলের 'বল বীর– বল উন্নত মম শির...'।
শামসুর রাহমানের দৃঢ় দৃপ্ত উচ্চারণে তোমাকে আসতেই হবে
হে স্বাধীনতা...
পদ্মা-মেঘনা-যমুনার কূলে কূলে
সুকান্তের–
হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ...
রাজনীতির মহাকবির 'জয় বাংলা' হুংকারে
স্বাধীনতা শব্দটি প্রথম উচ্চারিত
নির্মলেন্দু গুণের জীবন্ত সাক্ষ্য,
ঝঞ্ঝার বেগে চীন-মার্কিন-রুশ ছাপিয়ে মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ
হোচিমিনের ভিয়েতনাম, ম্যান্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকা
তুমি আসো ফিলিস্তিনে-সিয়েরালিয়নে
নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, শোষিত অবহেলিত
দলিত মথিত জনপদে– জাতিতে জাতিতে বধ্যভূমির
দামামা বাজিয়ে পিতার জন্মশতবর্ষে
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে– উন্নয়নের অভিযাত্রায়
শহিদের স্মৃতিসৌধে তুমি আসো...।

তারপর তুমি কবি

সৌম্য সালেক

খুব কম সময়ই তারা মায়ের সঙ্গ পেত
কেননা অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি কোপে এখানে শ্রমকাল বিস্তৃত
দীর্ঘ জুলুমের দহে পিষ্ট– ওদের
ভূমির কথা ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যেত
কারণ বাণী ও বিদ্যুতে জ্বলতে পারে তেমন বজ্রস্বর তাদের ছিল না।
তাহলে তাদের কি ছিল!

আসলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শোষণে দগ্ধ
এ জাতি চিরদিন কেবল মুক্ত পাখি হবার স্বপ্নই বুনেছে।

তারপর, তারও বহুপর
তারপর তুমি কবি
ভাঙতে এসে উৎপীড়কের ভিত
পড়েছিলে অমোঘ কবিতা, 'এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম'
সেই থেকে ঋগ্বেদে উচ্চারিত বঙ্গ আমাদের
বাংলাদেশ– আশাতীত স্বপ্নের মতো বাঙালির ॥

সেই তুমি

আরজুমান আরা

শেখ মুজিব
তোমার ত্যাগেই বাংলাদেশ
তোমার দেশপ্রেমে মুগ্ধ করেছ।

বঙ্গবন্ধু
তুমি ছিলে দুরন্ত নির্ভীক
তুমি ছিলে সত্য মহাপ্রাণ
তোমাকে দেখেছে সবাই
জনসভায় মিছিলে বিমুগ্ধ চোখে।

জাতির পিতা
তোমার ছয় দফা মুক্তির সনদ
তুমি বাঙালির মুক্তিদাতা
তুমি বাঙালির শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ
তুমি অমর মানবতাবাদী মহান দেশপ্রেমিক।

সেই তুমি
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান
শতবর্ষেও তুমি সবার হৃদয়ে
হাজার লক্ষ বছরেও তুমি রবে চির অম্লান।

‘দেশরত্ন’ শেখ হাসিনা

সোহরাব পাশা

তোমার সুখ্যাতি বিশ্বময়
কেননা তুমি তো মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
অশ্লীল আঁধার ভেঙে ছিনিয়ে এনেছ
নতুন ভোরের আলো
এই মৃত্তিকা, মানুষ, গোলাপ বাগান
আর ভোরের পাখিরা সে কথা জানে,

শুধু বাংলাদেশ আর বাঙালির নয়
সারা পৃথিবীর জন্যে এনেছ সোনালি
দিন, স্বপ্নময় সুবাতাস ;
পিতৃহারা, মাতৃহারা, কত প্রিয় স্বজন-হারানো
বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, অকৃপণ হৃদয়ে তুমি
ভালোবেসেছ বাংলার দুখি মানুষকে,
অশ্রুভরা চোখে ভালোবেসেছ এই
বাংলাদেশকে,
তুমি নিজ হাতে মুছে দিয়েছ মুক্তিযুদ্ধে
সন্তানহারা দুখি মায়ের চোখের জল,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গজননীর কন্যা
তুমি ‘দেশরত্ন’ শেখ হাসিনা, নক্ষত্রের মতো
তোমার নাম চির উজ্জ্বল অম্লান থাকবে এই বাংলায়
আর বাঙালির হৃদয়াকাশে;
শহর-বন্দরে, গ্রামগঞ্জে, সবখানে
আজ আনন্দের যে ঝরনাধারা, সে তো তোমারই জন্যে;
আন্তর্জাতিক বিশ্বে
তুমি উজ্জ্বল করেছ বাংলাদেশের সুনাম,
বাঙালি শিখেছে আজ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার
বিশ্ব জেনে গেছে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাঙালি
বাংলাদেশের অহংকার।

মে দিবস

আতিক আজিজ

দিবস প্রেমিক সময় বিলাসীরা শুধু ছুটি চায়
রবীন্দ্রনাথ শ্রীপঞ্চমী, রং মাখানো পূর্ণিমায়।

রক্তক্ষরণেও ছিন্নমস্তা মৌন তাপস, শান্ত, নীরব।

সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমাধিস্থ করার পর
ফেলে দেওয়া সুরাপাত্রে তৃষ্ণার জল ঢালে
সম্মোহনের আসর বসায়, মাদকতার শ্রম সন্ধ্যায়।

মাটি আরো ফুটোফাটা হয়, মায়ের লাঞ্ছিত উদারতায়।

তবু খরায় ভরা দহনকালের এই অবেলায়
জামাইষষ্ঠীর মে দিবসের কালবেলায়
আর কিছু নয় ছুটি, শুধু ছুটি চায়।

সেই ছেলেটি

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

চুরুলিয়ার দুখু মিয়া কাজীর ঘরের ছেলে
দুঃখ এবং দরিদ্রতাই ভূষণ ছিল যার
জানতো কেবা দুখু মিয়া সব পিছুটান ফেলে
দুখের মাঝে নিজের জীবন করবে একাকার!

লেটোর দলে গান গাইবে, যুদ্ধে যাবে সে-ই
বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণার আগুন ঝরা সুরে
ডাকতে দেশের নির্যাতিত সকল মানুষকেই
জানতো কেবা সে ছেলেটি উঠবে আকাশ ফুঁড়ে?

কাজীর ঘরের সেই ছেলেটি অনেক দুখের পর
দেশের প্রতি ভালোবাসার অকৃত্রিম টানে
সারা দেশে তুলল শেষে ভুবন-কাঁপা ঝড়
বিশ্ববাসী কাণ্ড দেখে ভীষণ অবাক মানে।

সেই ছেলেটি দুখি ছেলে, সবাই তাঁকে চিনি
মায়া ভরা তাঁর চেহারা, ঝাঁকড়া মাথার চুল
জন্মাবধি তাঁর কাছে তাই থাকব সবাই ঋণী
সে ছেলেটি আর কেউ নয়, সে কাজী নজরুল।

ঈদের গান লিখেন কবি

গোলাম নবী পান্না

‘ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ’
এ গানে পাই ঈদের বার্তা
তাতেই কাটে নিদ।
এমন মজার গানটি লিখেন
সবার প্রিয় কবি
গানের টানেই ভেসে ওঠে
সেই সে কবির ছবি।
তিনি আমাদের জাতীয় কবি
রাঙান মনের কূল
গানের কথায় নাম এসে যায়
প্রাণের এ ‘নজরুল’।
ঈদের গান লিখে কবি
খুশির জোয়ার আনে
ঈদ এলে তাই কণ্ঠে মিলাই
মধুর সুরের টানে।

মে দিবস

ওয়াসীম হক

তোমাদের কোদালের কোপগুলো স্পষ্ট
তোমাদের দিন-রাত প্রাণাতীত কষ্ট।
বেঁচে থাকা লড়ে যাওয়া এক মহাযুদ্ধ
প্রাপ্তির খাতা থাকে তবু অবরুদ্ধ।
শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির গান গাই
ভালোবাসা এই দিনে তোমাদের বলে যাই।

কোন কবি

আহসানুল হক

অগ্নিবীণার বাঁশি বাজান
শব্দ-ফুলে বাগান সাজান
মুয়াজ্জিনের দেন যে আজান

আঁধার কালো কেবল তাড়ান
মজুর-কুলির পাশে দাঁড়ান
ছোট্ট বেলায় বাবা হারান

সত্য জয়ে যুদ্ধে জড়ান
দুখির জন্য কাঁদে পরান
কাব্য লিখে দ্যুতি ছড়ান

শাসন-শোষণ অত্যাচারে
গর্জে ওঠেন বারে বারে
রাঙা প্রভাত আনেন দ্বারে
কোন কবি ? কোন কবি ?

সবার ঘরের দেয়াল বুকে
ডাগর চোখে সৌম্য মুখে
ঝুলে আছে...
যার ছবি! যার ছবি!

আজান হচ্ছে

আব্দুল আউয়াল রণী

আজানের শব্দে
ঘুম ভাঙে,
ওঠ নামাজি,
সন্তান-স্ত্রী লয়ে সঙ্গে।
ভোর হয়েছে,
শয্যা করো ত্যাগ,
পাক পবিত্র হয়ে
স্রষ্টার বিধানে দাও যোগ।
আজান হয়েছে
নামাজে এসো।
নামাজ কায়েম করে,
কর্মস্থলে বসো।
আজান হয়েছে
মুয়াজ্জিন ডাকছে
পৃথিবীতে এসেছি
ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি
ক্ষণিকের পৃথিবী
কেন এত দম্ভ দাপটের দাবি
এই আছি এই নাই,
ধনদৌলত পড়ে থাকবে সবি।

ঈদুল ফিতর

আবুল হোসেন আজাদ

আকাশের ঝুল বারান্দায়
ছেঁড়া ছেঁড়া রক্তিম মেঘের ফাঁকে এক ফালি চাঁদ
ত্যাগ তিতিক্ষা সিয়াম সাধনার রমজান শেষে
এনে দিল কী প্রশান্তির হিল্লোল
ছন্দায়িত নৃত্য পাগল খুশির বাঁধভাঙা ঢেউ
এল ঈদ, ঈদুল ফিতর।

ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে এক হৃদয়
বেহেশতি পয়গাম নিয়ে এল ঈদ
প্রজাপতির পাখা চঞ্চলতায় বিভোর
পুষ্পিত কানন উড়ন্ত পাখির দুরন্ত ডানা
অভূতপূর্ব হৃদয়ে ঝরনার ঝর ঝর ফল্গুধারা
অনাবিল আনন্দে মশগুল আজ–
এল ঈদ, ঈদুল ফিতর।

ভেদাভেদ কুটিল অহমিকা জলাঞ্জলি দিয়ে
এক জামাতে কাঁধে কাঁধে বুকে বুকে কোলাকুলি
হর্ষোচ্ছ্বাসে সারা দিন খরতাপে যেন এক পশলা বৃষ্টি
বিপুল সমাহার খুশিমতো আহারের–
গরিব-দুখি-নিঃস্ব-ধনী এ আনন্দে একাকার
এল ঈদ, ঈদুল ফিতর।

ঈদকে কাছে পাওয়া

নাসিমা আক্তার নিঝুম

আজ অপেক্ষা নয়
এসেছে ঈদের দিন,
আনন্দে ভরে উঠবে পাড়া
জীবন হবে সুন্দরে রঙিন।

পাড়াপড়শির গৃহে যাওয়া
ঈদকে গভীরভাবে কাছে পাওয়া
চিরস্মরণীয় কিছু কথা;
ভীষণভাবে মানুষকে টানে
কোলাকুলির মধ্য দিয়ে।

যেমন অকৃত্রিম ভালোবাসায়
ফুটে উঠে ফুল।
জীবনে আছে অনেক ভুল
সব ভুল মুছে যাক;

আর যত মান অভিমান
দূরে সরে যাক,
বরণীয় হয়ে ঈদ দিনটা
আমাদের সাথে থাক।

ঈদের চাঁদ

বশিরুজ্জামান বশির

ঈদের চাঁদে ফড়িং বসে
চাঁদ ফড়িংয়ের দল
চাঁদের সাথে দলবেঁধে
কে কে যাবি চল।
চাঁদ চেনে না ধনী-গরিব
চাঁদের তো নেই রাগ
চাঁদের সাথে তুলতে ছবি
মন করো না ভাগ।
চাঁদকে বলি ঈদের দিনে
মায়ের পাশে থাকো
আমার মতো সবার মনে
ঈদের ছবি আঁকো।

বাসি বকুল

অর্ণব আশিক

বুঝে নিতে চাই জীবনকে
আর কতদূর হেঁটে যেতে হবে অন্ধকারে
কতটা বুকের রক্ত দিয়ে
পলাশ বনের মতো সাজাবো জীবন
অথবা যাযাবর পাখির পালকের মতো
উড়তে উড়তে হারিয়ে যাব আকাশের নীলে
এবার সময় হয়েছে বিনম্র আত্মসমর্পণ ছেড়ে
ঘুরে দাঁড়াব তীব্র অভিমানে।
জীবনের আঙিনায় এখনো ফোটে ফুল
শুধু রং তার বিষণ্ন হলুদ
হাতের কবজিতে বাসি বকুল।

ঈদের চাঁদ

এইচ এস সরোয়ারদী

কী যে মিষ্টি ঈদের চাঁদ
মিষ্টি ঢেপের খই
ফিরনি খেয়ে খোকা-খুকু
নাচে তা থই থই।
কী যে মিষ্টি লাল জামা আর
মিষ্টি মোহনবাঁশি
ঈদের চাঁদ তোমায় আমি
অনেক ভালোবাসি।

হৃদয়ের ফুল কাজী নজরুল

কবির কাঞ্চন

গেয়ে গেলে চিরদিন সাম্যের গান
বিদ্রোহী নেই কেহ তোমার সমান।
গল্প কবিতা গানে তুমিই সেরা
সফল জনমে হলো তোমার ফেরা।
সকলের কবি হলে লেখার দ্বারা
বাংলাসাহিত্যে তুমি ধ্রুবতারা।
তুমিই তো বাঙালির হৃদয়ের ফুল
জাতীয় কবি তুমি কাজী নজরুল।

ঈদের খুশি

এম ইব্রাহীম মিজি

ঈদের খুশি আকাশে আর
ঈদের খুশি জমিনে
ঈদের খুশির জোয়ার দেখে
কেউ সহজে দমিনে।
দিনের শেষে রাত্রি এলেও
থামে না যে খুশির ঢল,
রাতের আঁধার আলোকিত
করে দুষ্টু ছেলের দল।
সবাই তোরা আনন্দ কর
ডেকে বলে বাপের পুত,
আনন্দের জোয়ার দেখে
পালায় গাছের পেত্নী-ভূত।

মহাকাল

বোরহান মাসুদ

সকলেই আসে শূন্য দুই হাতে
দিনে বা হয়ত কোনো এক রাতে
কেউ কাজ করে পূর্ণতা পায়
শূন্যতেই কেউ নিজকে হারায়
সময় বিলায় কেউ ভালোবেসে
কেউ কাঁদে আর কেউ থাকে হেসে
বেলা শেষে ফিরে কেউ খালি হাতে
পেল না তখন কাউকেই সাথে
কেউ হাত দুটি ভরে ফিরে যায়
মহাকালের এক মহা সময়
মনে কেউ রাখে, কেউ ভুলে যায়
দোল খায় শত আশা-নিরাশায়।

মা

জব্বার আল নাঈম

মেঘ থেকে ছিটকে পড়া বৃষ্টির হা-হুতাশ নেই
মহাকালের পাঠ্যবইয়ে
ক্লান্ত সময় হারিয়ে যায় পাহাড়ি ধুলায়
বৃষ্টি ফিরে যায় মেঘের কোমল কোলে।

এক চিলেকোঠা সন্ধ্যায়– সাগরের পেট থেকে
অস্থিমজ্জা রক্তপানি নিয়ে
মাসিদের মজলিশে
ভীষণ ভাবছি...

রাতের শিথানে চেরাগ নিভিয়ে দিয়ে দরদি গলাটি
অন্ধ ঘরে আলোর স্নেহ ঢেলে বাড়তে দেয়– মাল্টিবাগান;
সমুদ্রের দুই তীর ক্রমান্বয়ে ফুলে ওঠা বোধের উঠান
আমি, আমরা, হাজার হাজার প্রজন্ম সন্তান।
তবু আমাদের মায়ের পরাগায়ন অনবরত চলছে...

মোম হৃদয়ের গহীনে লুকানো সুতা জ্বালিয়ে
আলোকিত করে সুন্দর পৃথিবী; আমাদের মা।

মা অনন্য এক মানবী

রূপশ্রী চক্রবর্ত্তী

এক মানবীর চোখে ছিল রাজ্যের বিস্ময়,
ঠিক ততটুক বিস্মিত শিশুটি।
চাঁদের কোমলতায়, সূর্যের উজ্জ্বল আভায়
দেদীপ্যমান মুখখানি কার?
ভাবে শিশু।

জননীর কোলে দোলে
শিশু থেকে হয় কিশোরী,
আদরে শাসনে কিশোরী থেকে তরুণী,
বিস্ময়ের ঘোর কাটে না তার চল্লিশেও।
মায়ের মায়াবী কণ্ঠের জাদুতে
আজও হয় মোহগ্রস্ত।

সত্তায় চিরপুরাতন
কিন্তু নিত্য নবীন রূপে সে দেখে জননীকে।
জননী যেন শুধু নন তার,
শিক্ষক মায়ের কাছে সকল শিক্ষার্থী তাঁর সন্তান।

আজ একটু আলো ছড়িয়ে জীবনকে উপভোগ করার পালা মায়ের।
অসম্ভব প্রতিভাধরেরা বুঝি এমনতর হয়,
মায়ের মতো এমনি!!
সাম্য, মানবতা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি
আর মমতার চাদরে মোড়ানো এক দেবদূত এই জননী,
যাঁর বুকের ওমে বন্দি তরুণীর প্রাণ ভোমরা।
তাঁরও ইচ্ছে হয়,
জননীকে আগলে রাখতে।
'থেকো মা, আমার কন্যা হয়ে'।

দুর্নীতিকে করব রোধ

খোরশেদ আলম নয়ন

আসুন সবাই শপথ করি
দুর্নীতিকে করব রোধ
নৈতিকতায় জাগিয়ে স্বদেশ
আমরা করি গর্ববোধ।

শিষ্টাচারে নিষ্ঠা থাকুক
মুক্ত হও দুর্নীতিতে
দেখব তখন হাসছে স্বদেশ
অপূর্ব সম্প্রীতিতে।

দুর্নীতিকে রুখে ন্যায়ের
পথটি ধরে থাকব
লাল-সবুজের এই পতাকা
ঊর্ধ্বে তুলে রাখব।

জাগো নারী

সাবিত্রী রানী

জাগো জাগো ভগিনী
জাগো তাড়াতাড়ি
নিজেকে কর কর্মমুখী
স্বয়ংসম্পূর্ণা নারী।
বেগম রোকেয়া দেখিয়েছেন
মোদের আলোর পথ
সে পথ ধরে এগিয়ে যাও
চালাও তোমার রথ।
কত নারী লাঞ্ছনা পায়
আর অবহেলা অসম্মান
কর্ম দিয়ে ঘুচাও এবার
তোমার যত অপমান।

চলে যাওয়া

জান্নাতুল ফেরদৌস স্মৃতি

মাঝে মাঝে ভয় হয়
মৃত্যু কখন এসে আমায় নিয়ে যায়
ইচ্ছে না করলেও হয়ত
চলে যেতে হবে
সব চাওয়া-পাওয়া
দুঃখ-কষ্টগুলো পড়ে রবে।
অতৃপ্ত আত্মা চিৎকার করে কাঁদবে
আমি চাই না সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে
এমনি চলে যেতে
আমার আশা ভালোবাসা
স্বপ্নগুলো ভেসে রবে চোখের পাতাতে।
কেউ কি তা বুঝবে!

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবদান রাখার আহ্বান জানান। ২৮শে এপ্রিল 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তিনি আরো বলেন, অসচ্ছলতা, অজ্ঞতা ও নানাবিধ আর্থসামাজিক প্রতিকূলতার কারণে দেশের দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন জনগণ অনেক ক্ষেত্রে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের সমান আশ্রয় লাভ'–এর অধিকারকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০'। এ আইনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজের হতদরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠী বর্তমানে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-এর সঙ্গে ২৭শে এপ্রিল ২০২১ বঙ্গভবনে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী General Wei Fenghe সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

বঙ্গবন্ধু ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু

১লা মে 'মহান মে দিবস–২০২১' উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতার উদ্যোগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে এবং আইএলও-এর ৬টি কোর কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। এটি শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য মাইলফলক।

সরকারের পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে শ্রমজীবী মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারিতে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশেও করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়াল থাবা আঘাত হেনেছে। ফলে গভীর সংকটে পড়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। এ পরিস্থিতিতে সরকার জনগণের পাশে থেকে ত্রাণ কাজ পরিচালনাসহ সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সরকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তাই কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য– 'শ্রমিক-মালিক নির্বিশেষে, মুজিববর্ষে গড়বো দেশ' –অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার গৌরবগাথার সাক্ষর

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭০-এর নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি সাংবিধানিক সরকার আত্মপ্রকাশ করে। এই সরকার গঠনের ফলে বিশ্ববাসী স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকার যে ভূমিকা পালন করছে তা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবগাথার সাক্ষর হয়ে থাকবে। ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সব বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৭ই এপ্রিল এক স্মরণীয় দিন। এই মাহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,

মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে, যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালনার মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এছাড়া তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারী সর্বস্তরের জনগণ ও বিদেশি বন্ধুদেরকে। বাণীতে রাষ্ট্রপতি মুজিবনগর দিবসে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই এপ্রিল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা'র সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত এক হাজার ৮০০ নারীসহ এক লাখ ৭৫ হাজারের বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী পাঁচটি মহাদেশের ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সাত হাজারের বেশি বাংলাদেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য ১৯টি মিশনে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত আছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের শান্তিরক্ষীরা যে মিশনেই গেছেন, সেখানে জাতিসংঘের পতাকাকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করেছেন। একারণেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, যে-কোনো দেশের জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত সশস্ত্রবাহিনী অপরিহার্য। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সক্ষমতা যাচাইয়ে নিয়মিত অনুশীলনের বিকল্প নেই। জাতির পিতা স্বাধীন বাংলাদেশের একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অত্যাধুনিক সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তিনি বলেন, গত ১২ বছরে আমরা আমাদের তিন বাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি। আমাদের সামরিক বাহিনীতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও প্রযুক্তি সংযোজন করেছি। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নিরসনে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। আমরা মহামারির সময়েও ৫ দশমিক ৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি এবং বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি।

বিশ্ব নেতাদের প্রতি চার পরামর্শ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক দুই দিনব্যাপী 'লিডারস সামিট'-এর উদ্‌বোধন সেশনে ভিডিও বার্তায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় চারটি পরামর্শ বিশ্ব নেতাদের সামনে উপস্থাপন করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সম্মেলনের ভার্চুয়াল উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জন বিশ্ব নেতাকে এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান জো বাইডেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম পরামর্শ হলো– বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম রাখতে উন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে তাদের তাৎক্ষণিক ও উচ্চাভিলাষী অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও প্রশমন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হতে হবে। দ্বিতীয় পরামর্শ হলো– বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই এপ্রিল ২০২১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আয়োজনে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাসে 'অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা'র সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বিভিন্ন দেশের সেনা সদস্যকে সম্মাননা পত্র প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে এ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন– পিআইডি

পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিলের ৫০ শতাংশ অভিযোজন ও ৫০ শতাংশ প্রশমনের জন্য কাজে লাগানো। তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে– উদ্ভাবন এবং জলবায়ু অর্থায়নে (concessional climate financing) বড়ো অর্থনীতির দেশ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সেক্টরগুলোকে এগিয়ে আসা। চতুর্থ পরামর্শ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ অর্থনীতি এবং কার্বন নিরপেক্ষ প্রযুক্তিতে ট্রান্সফার হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

দুঃসাহসী অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন শেখ জামাল

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ জাতির পিতার দ্বিতীয় পুত্র শহিদ শেখ জামালের ৬৮তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, শেখ জামাল ছিলেন দুঃসাহসী অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, জননেত্রী শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় কন্যা শেখ রেহানা, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের সঙ্গে শেখ জামালও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁদেরকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অন্তরিন করে রেখেছিল। সেখান থেকে দুঃসাহসিকতার সাথে পালিয়ে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ২৮শে এপ্রিল রাজধানীর মিন্টু রোডের বাসভবনে সীমিত পরিসরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শহিদ শেখ জামালকে দেশের একজন দক্ষ সেনা অফিসার হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লং কোর্সের প্রথম ব্যাচের কমিশন অফিসার। শেখ জামাল যুগোস্লাভিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্ট একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে যোগদান করেন।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাত্রিতে ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে জাতির পিতা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে শাহাদতবরণকারী শেখ জামালের বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি।

আরো দুই হাজার সাংবাদিক পাবেন করোনাকালীন সহায়তা

আরো দুই হাজার সাংবাদিককে করোনাকালীন সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২৫শে এপ্রিল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. হাছান মাহ্‌মুদ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের জরুরি সভা শেষে সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

করোনা মহামারির মধ্যে কর্মরত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মৃত্যুবরণকারী সাংবাদিকদের আত্মার শান্তি, অসুস্থদের সুস্থতা এবং পৃথিবীর করোনামুক্তি কামনা করে মন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন লকডাউন চলছে, সরকারি ছুটিতে মন্ত্রণালয়গুলো বন্ধ, এর মধ্যেই আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কীভাবে সাংবাদিকদের সহায়তা করতে পারি, সেজন্যই আজকে এই জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় আপাতত ২ হাজার সাংবাদিককে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে এককালীন সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই অর্থবছরে কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত সহায়তার আওতায় আরো প্রায় দুই শতাধিক সাংবাদিককে সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির মধ্যে সাংবাদিকদের ভূমিকা এবং অসচ্ছল, নানা কারণে চাকরিচ্যুত বা চাকরি থাকা সত্ত্বেও বেতন না পাওয়া সাংবাদিকদের সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে করোনা মহামারির প্রথম দফায় সারা দেশে দল-মত নির্বিশেষে ৩ হাজার ৩শ ৫০ জন সাংবাদিককে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধু প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে সরকারের ওপর বিষোদ্‌গার করেন, তাদের মধ্যে অসচ্ছলরাও যেন এই সহায়তা থেকে বাদ না যায়, আমার সেই অনুরোধ সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ রেখেছিলেন, এজন্য তাদের ধন্যবাদ।

করোনাকালে সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতি বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসময় এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, অনভিপ্রেত ও আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। আমি জানি, সংবাদমাধ্যমগুলো করোনাকালে অন্যান্য ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মতোই নানা সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু বিষয়টাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অনুরোধ আমি শুরু থেকেই করেছিলাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটি অনুসরণ করা হয়নি। সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সম্প্রতি যেখানে চাকরিচ্যুতি হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো চেষ্টা করছে। যাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদেরকে পুনর্বহাল করার দিকেই কর্তৃপক্ষ যাবে, এই আমার প্রত্যাশা।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৬শে এপ্রিল ২০২১ জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে ১৭ই এপ্রিল ২০২১ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন– পিআইডি

RvZxq NUbvi we‡kl cwZ‡e`b

ঢামেক-এ ১০টি আইসিইউ শয্যা উদ্‌বোধন

১লা এপ্রিল: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বারিধারার নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকা মেডিকেল কলেজের নতুন ১০টি আইসিইউ শয্যা উদ্‌বোধন করেন।

বিশ্ব অটিজম দিবস পালিত

২রা এপ্রিল: সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও অনাড়ম্বরভাবে পালিত হয়ে গেল ১৪তম বিশ্ব অটিজম দিবস। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র ও নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়– 'মহামারিতোর বিশ্বে ঝুঁকি প্রশমন, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হবে প্রসারণ'।

বিটিসিএল-এর ওটিটি কলিং সেবা 'আলাপ'-এর উদ্‌বোধন

৪ঠা এপ্রিল: ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ভার্চুয়ালি বিটিসিএল-এর ওটিটি কলিং সেবা 'আলাপ' অ্যাপটির উদ্‌বোধন করেন।

৪৩তম ডি-৮ কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত

৬ই এপ্রিল: ৫-৬ই এপ্রিল ৪৩তম ডি-৮ কমিশনের সভা দুই দিনব্যাপী ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২১ পালিত

৭ই এপ্রিল: 'মুজিববর্ষের শপথ, নিরাপদ রবে নৌপথ' –প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭-১৩ই এপ্রিল দেশে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২১ পালিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত

সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও ৭ই এপ্রিল পালিত হয়ে গেল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য– 'সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি'।

বিডা'র অনলাইন ওএসএস পোর্টালে যুক্ত হলো ৫টি নতুন সেবা

১৩ই এপ্রিল: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-র অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে নতুনভাবে যুক্ত হলো ৫টি নতুন সেবা।

৭৮টি বৈদেশিক মিশনের জন্য ওয়েবসাইট পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্‌বোধন

বিদেশে বাংলাদেশের ৭৮টি মিশনের জন্য অভিন্ন ওয়েবসাইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপিত

১৭ই এপ্রিল: সারা দেশে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম, ডাটা কার্ড এবং বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন : শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

ভাসানচর ঘুরে দেখলেন ১০ রাষ্ট্রদূত

নোয়াখালীর হাতিয়ায় ভাসানচর পরিদর্শন করলেন ১০টি পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার। ৩রা এপ্রিল সরকারের উদ্যোগে তারা এ সফর করেন।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, জাপান, নেদারল্যান্ডস ও কানাডার মিশন প্রধানগণ ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন। সেসময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমা দূতদের এই সফরকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সরকারি সংস্থাগুলো। এর আগে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদলও ভাসানচর পরিদর্শন করে।

এদিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ১০ দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার ভাসানচরে অবস্থান করেন। এসময় তারা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় ৩রা এপ্রিল ২০২১ সরকারের উদ্যোগে ভাসানচর পরিদর্শন করেন ১০টি পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার

ভাসানচরের এক নম্বর ওয়্যার হাউসে বিভিন্ন বয়সের রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তাদের সুযোগ-সুবিধা, জীবনযাত্রার মানসহ নানা বিষয়ে মতবিনিময় এবং দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

পাঁচ লাখ টিকা উপহার দিল চীন

চীনের উপহারের ৫ লাখ কোভিড টিকা ১২ই মে দেশে আসার কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। ৫ই মে তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান। এসময় যুক্তরাষ্ট্র থেকেও টিকা আনার চেষ্টা চলছে বলেও মন্ত্রী জানান। এদিকে সম্প্রতি দেশে চীনের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা সিনোভ্যাকের জরুরি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে চীন থেকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ টিকা আসার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন স্বাস্থ্য সচিব লোকমান হোসেন মিয়া। এদিকে ১১ই মে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক জানিয়েছেন, করোনার টিকা কেনার জন্য চীনকে চিঠি দিয়েছে সরকার। প্রাথমিকভাবে ৪ থেকে ৫ কোটি ডোজ চাওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে-ই ক্ষমতায় আসুক ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে

পশ্চিমবঙ্গে যে-ই ক্ষমতায় আসুক না কেন ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক একইরকম থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। ৩রা এপ্রিল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, ভারত আমাদের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ। ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির জয়ে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি প্রশ্নে ড. মোমেন বলেন, তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে আমরা আগের মতোই কাজ করে যাব।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বর্ণযুগের প্রবেশদ্বারে বাংলাদেশ

স্বর্ণযুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। এখন থেকে অপরিশোধিত বা আকরিক স্বর্ণ এনে দেশেই পরিশোধন করে সেটি রপ্তানি করতে পারবে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। এ জন্য স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনের সুযোগ পাবেন এ খাতের উদ্যোক্তারা। শুধু স্বর্ণ নয়, হীরা, রৌপ্যসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর আকরিক বাংলাদেশে আমদানি করে সেটি পরিশোধনের সুযোগ দিয়েছে বর্তমান সরকার।

১৭ই মে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ (সংশোধিত ২০২১)' খসড়াটি অনুমোদনের ফলে বাংলাদেশের শিল্প খাত স্বর্ণযুগে প্রবেশের এই সুযোগ পেয়েছে। সংশোধনী নীতিমালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুধু স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বর্ণের সঙ্গে হীরাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও পরিশোধনের সুযোগ রাখার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন।

সূত্র জানায়, স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বেলজিয়াম, ইউরোপীয় দেশ এবং ভারত ও চীন অন্যতম। আর প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে আছে সুইজারল্যান্ড, চীন, যুক্তরাজ্য, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বেলজিয়াম, জার্মানি ও সিঙ্গাপুর। এসব দেশের সঙ্গে এখন থেকে বাংলাদেশের নাম সংযুক্ত হবে।

শক্তিশালী অবস্থানে টাকার মান

করোনার মধ্যে অর্থনীতির অন্যান্য সূচকগুলো দুর্বল হয়ে পড়লেও বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে কাবু হয়নি টাকার মান। বরং প্রতিবেশী দেশ ভারতীয় রুপি, মার্কিন ডলারের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে টাকার মান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর তদারকি, রেমিট্যান্স প্রবাহের ঊর্ধ্বমুখী ধারাবাহিকতার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ডলারের চাহিদা কমে গেছে। সব মিলেই বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা অব্যাহত থাকার কারণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, বৈধ পথে কেউ রেমিট্যান্স পাঠালে ২ শতাংশ নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এতে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে গেছে। কমে গেছে হুন্ডি তৎপরতা। অপর দিকে, বাজার থেকে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিনে নিয়েছে। এর ফলে বাজারে ডলারের মূল্য বড়ো আকারে পতন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে মনে করেন ব্যাংকাররা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার না কিনলে প্রতি ডলারের দাম ৭০ টাকায় নেমে যেত। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন প্রবাসীরা ও রপ্তানিকারকরা। মূলত রেমিট্যান্স প্রবাহ ধরে রাখার জন্য এবং রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কিনে নেয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মজুদ যেমন শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রাবাজারও স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে।

প্রথমবারের মতো বিলুপ্তপ্রায় ঢেলা মাছ উৎপাদন

এক সময় দেশের নদনদী ও হাওড়-বিলে প্রচুর পরিমাণে ঢেলা মাছ পাওয়া যেত। পরবর্তীতে জলবায়ু পরিবর্তন, অতিআহরণ ও

ঢেলা মাছ

জলাশয় সংকোচনের কারণে ঢেলা মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এ মাছটি বিলুপ্তির তালিকায় চলে আসে।

এবার বিলুপ্তপ্রায় সুস্বাদু ঢেলা মাছের পোনা উৎপাদনে সফল হয়েছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) গবেষকরা। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদু পানি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা দেশে প্রথমবারের মতো এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। ময়মনসিংহে অবস্থিত মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদু পানি গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকরা দুবছর ধরে গবেষণা চালিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ঢেলা মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেন।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ফ্রিল্যান্সিংয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

বিশ্বে ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় উল্লেখ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ডিজিটালাইজেশনের পাশাপাশি ডিজিটাল ট্যালেন্ট তৈরির এখনই উপযুক্ত সময়।

২০শে মে হুয়াওয়ের উদ্যোগে অনলাইনে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ট্যালেন্ট রিজিওনাল সামিটে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ এদেশের মাটি ও মানুষ। এর প্রতিফলন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। করোনা মহামারির পরও উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার সব শর্ত পূরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর পেছনে রয়েছে সব ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার। যার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ভিশন-২০২১।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২০শে মে ২০২১ হুয়াওয়ের উদ্যোগে অনলাইনে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ট্যালেন্ট রিজিওনাল সামিটে অংশ নেন

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের আয় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। সারা বিশ্বে ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, হুয়াওয়ে দেশের ডিজিটালাইজেশনে এবং তরুণ সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার পেল বাংলাদেশ

বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ) পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি-ডব্লিউএসআইএস উইনার ২০২১' অর্জন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

১৮ই মে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তির পর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

বিটিআরসি'র সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম বা সিবিভিএমপি প্রকল্পটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার ২০২১ প্রতিযোগিতার অ্যাকশন লাইন সি-ফাইভ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অ্যাকশন লাইন সি-ফাইভের মূল প্রতিপাদ্য– 'বিল্ডিং কনফিডেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন ইউজ অব আইসিটিস'। ডব্লিউএসআইএস ফোরামের প্রধান লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করে ধনী-দরিদ্র দেশগুলোর মাঝে ডিজিটাল বিভাজন দূর করা।

ডব্লিউএসআইএসের প্রতিযোগিতায় সরকারি, বেসরকারি, সাধারণ নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প জমা দেওয়ার পাশাপাশি ডব্লিউএসআইএসের অংশীদাররাও এতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত আবেদন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাছাই ও অনলাইন ভোটিং প্রক্রিয়ার শেষে চূড়ান্ত বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। মোট ১৮টি ক্যাটাগরিতে আবেদন গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি ক্যাটাগরিতে একটি করে ১৮টি প্রকল্পকে চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিটিআরসি চলতি বছরই প্রথম এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সিবিভিএমপি প্রকল্পটি ১৫ হাজারের বেশি ভোট পায়।

পুরস্কার পাওয়ার পরে ১৮ই মে বিটিআরসি'তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিশনের মহাপরিচালক (সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সিবিভিএমপি

সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, সিবিভিএমপি বিশ্বে একটি স্বীকৃত প্রকল্প। এটি বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মাননা বয়ে এনেছে।

বিটিভি দেখা যাবে মোবাইল অ্যাপে

অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) অনুষ্ঠান। ১২ই মে সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম বিটিভি'র অ্যাপের উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে বসে এখন বিটিভি দেখা যাবে। মানুষের এখন ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। এখন সময় করে আর প্রতিদিন টিভির সামনে সবাই বসতে পারেন না। তিনি বলেন, সবার হাতেই এখন মোবাইল ফোন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন চালু করেছে বিটিভি অ্যাপ, এটি প্রশংসার দাবি রাখে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্র এবং ১৪টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বর্তমানে বিটিভি'র সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে জানান ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, আরো ছয়টি বিভাগীয় শহরে আগামী দুই বছরের মধ্যে বিটিভি'র আরো কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিটিভি'র মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন বলেন, বিটিভি'কে আরো বেশি মানুষের কাছে নিতে এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন (Bangladesh television) নামের অ্যাপটি গুগলের অ্যান্ড্রয়েড ও অ্যাপলের আইওএস ফোনে ডাউনলোড করা যাবে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি বাড়াতে ১৯ পণ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, দেশের রপ্তানি পণ্য সংখ্যা ও বাজার সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। শুধু তৈরি পোশাকের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। তাই দেশের সম্ভাবনাময় ১৯টি রপ্তানি পণ্যকে টার্গেট করে সরকার কাজ করছে। রপ্তানি পণ্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রতিবছর একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যকে 'প্রোডাক্ট অব দি ইয়ার' ঘোষণা করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'ইসিফোরজে' নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে লেদার গুডস, প্লাস্টিক, ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং–এ চারটি রপ্তানি পণ্যের সেক্টরকে যুক্ত করে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে। বাণিজ্যমন্ত্রী ৮ই মে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আইসিএবি আয়োজিত 'ডাইভারসিফিকেশন অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট বাসকেট: অপারচ্যুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বাণিজ্য সুবিধা আদায়ের জন্য পিটিএ বা এফটিএ-এর মতো বাণিজ্য চুক্তি করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভুটানের সঙ্গে পিটিএ স্বাক্ষর করা হয়েছে। আরো বেশি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করার জন্য আলোচনা চলছে।

পরিত্যক্ত ধানের চাতালে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ

স্পিরুলিনা (সমুদ্রের শৈবাল) অনেকের কাছে অপরিচিত মনে হলেও মানবদেহের জন্য এটি খুবই উপকারী। বাংলাদেশে স্পিরুলিনার বাণিজ্যিক চাষ নেই। সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ীতে। সাতজন

পরিত্যক্ত ধানের চাতালে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ

উদ্যোক্তা যৌথভাবে স্পিরুলিনার বাণিজ্যিক চাষ শুরু করেছেন। ফুলবাড়ি অ্যাগ্রো কোম্পানি নামের একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান এই স্পিরুলিনার বাণিজ্যিক চাষের উদ্যোগ নেয়। এখন পর্যন্ত তাদের খরচ সাড়ে তিন লাখ টাকা। কোম্পানিটি ২৪ হাজার লিটার পানিতে স্পিরুলিনা উৎপাদন করছে, যা বাংলাদেশে প্রথম।

স্পিরুলিনা চাষ করে এরই মধ্যে সাড়া ফেলেছেন ফুলবাড়ীর সেলিম রেজা, মাসুদ ও জাকির হোসেনরা। বাড়ির পরিত্যক্ত ধানের চাতালে বর্তমানে ২৪ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার রয়েছে। এটি তাদের তৈরি করা। এখানেই বাণিজ্যিকভাবে চলছে স্পিরুলিনার চাষ। ৫ই এপ্রিল থেকে স্পিরুলিনা আহরণ শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা। যৌথ উদ্যোক্তাদের একজন সেলিম রেজা বলেন, তিনি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পিরুলিনার ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সপ্তাহে ২৪ লিটার পানি থেকে উৎপাদন হচ্ছে ২৪ কেজি স্পিরুলিনা, যার বাজার মূল্য প্রতি কেজি ৫ হাজার থেকে ৩২ হাজার টাকা। এক বছরে স্পিরুলিনা উৎপাদন বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবকিছু ঠিক থাকলে স্পিরুলিনা উৎপাদন করে ১১ লাখ টাকা আয় হবে বলে ধারণা করছেন।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

কোটি মায়ের নগদ অ্যাকাউন্টে প্রাথমিক উপবৃত্তির টাকা

ডাক বিভাগের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ কেনার ভাতা বিতরণ করছে সরকার। মহামারির মধ্যে সরকার গত তিন মাসে এক কোটি মায়ের 'নগদ' অ্যাকাউন্টে এক প্রান্তিকের উপবৃত্তির টাকা পাঠিয়েছে। এ দফায় ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে জুন প্রান্তিকের উপবৃত্তির আটকে থাকা সাড়ে চারশ টাকা পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। কর্মকর্তারা বলছেন, চলতি মাসে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের আরো দুই প্রান্তিকের উপবৃত্তিসহ ২০২১ সালের শিক্ষা উপকরণ কেনার ভাতা দেওয়া হবে।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নগদ

মহামারির মধ্যে প্রাথমিকের উপবৃত্তি বিতরণের এই প্রকল্প বন্ধ ছিল প্রায় এক বছর। পরে গত ডিসেম্বরে 'নগদ'-এর সঙ্গে চুক্তি করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। চুক্তির তিন মাসের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থী ও তাদের মায়ের তথ্যসহ ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

সরকারের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের (তৃতীয় পর্যায়) পরিচালক অতিরিক্ত সচিব ইউসুফ আলী বলেন, জানুয়ারির শেষ থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত টাকা পাঠানো হয়েছে। এপ্রিলের মধ্যে প্রায় ১ কোটি মায়ের হাতে নগদের মাধ্যমে আবার টাকা পৌঁছে যাবে। প্রথমবার হওয়ায় কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে। এবার আশা করছি বাকি দুটো কিস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো ভালো সার্ভিস পাব। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নগদের মাধ্যমে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের ফলে সরকারের খরচও এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে।

গত কয়েক বছর ধরে আরেক মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস শিওর ক্যাশের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করত সরকার। তাতে প্রতি হাজার টাকার উপবৃত্তি বিতরণে সাড়ে ২১ টাকা সার্ভিস চার্জ এবং ক্যাশ-আউট চার্জ লাগত। এখন সব মিলিয়ে প্রতি হাজারে সরকারের লাগছে সাত টাকা। মূল টাকার সঙ্গে ক্যাশ-আউটের খরচ পেয়ে যাওয়ায় সুবিধাভোগীদেরও বাড়তি কোনো অর্থ খরচ করতে হচ্ছে না।

কওমি'তে পাসের হার ৭৪.০৪ শতাংশ

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর ৪৪তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৭৪.০৪ শতাংশ। তার মধ্যে ছাত্র ৮২.১০ শতাংশ এবং ছাত্রী ৫৭.২১ শতাংশ। রাজধানীর যাত্রাবাড়ির নিজস্ব কার্যালয়ে বেফাক ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুফতি আমিনুল হক বোর্ডের পক্ষ থেকে বেফাকের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও আল-হাইয়াতুল উলয়ার চেয়ারম্যান আল্লামা মাহমুদুল হাসানের কাছে ফলাফলের অনুলিপি হস্তান্তর শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন। এ সময় ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক, ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়েরসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

wewb‡qvM: we‡kl cwZ‡e`b

ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনেক সুযোগ

আন্তর্জাতিক জোট ডেভেলপমেন্ট এইটের (ডি-৮) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনেক সুযোগ আছে। কিন্তু এই সুযোগ তেমন কাজে লাগছে না। কোভিড-১৯ যখন মহাদুর্যোগ নিয়ে এসেছে, তখন অর্থনীতির ওপর আসা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ডি-৮-এর সদস্য দেশগুলো মিলেমিশে কাজ করতে পারে। ৫ই এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডি-৮ বিজনেস ফোরামের অধিবেশনে বক্তারা এসব কথা বলেন। ডি-৮ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডি-৮ সিসিআই) এবং বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৫ই এপ্রিল থেকে দশম ডি-৮ সম্মেলন ২০২১ শুরু হয় ঢাকায়। তারই একটি সহযোগী অনুষ্ঠান হচ্ছে ডি-৮ বিজনেস ফোরাম। অধিবেশনে এফবিসিসিআই সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম স্বাগত বক্তব্য দেন। সঞ্চালনা করেন

৫ই এপ্রিল ২০২১ ঢাকায় দশম ডি-৮ সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম স্বাগত বক্তব্য দেন

এফবিসিসিআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ মাহফুজুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, ব্যাবসা, যোগাযোগ ও সহযোগিতা– এসব কারণে ডি-৮-এর সদস্যদের মধ্যে জোরালো বন্ধন থাকা চাই। কোভিড-১৯-এর এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে তা আরো বেশি করে দরকার। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলোকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বাড়াতে ডি-৮ সিসিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন আবদুল মোমেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্লক চেইন, উদ্ভাবন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা– এসবের দিন সামনে। একে অপরের সঙ্গে এগুলোর বিনিময় করে ডি-৮-এর সদস্যদের এগোতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বেশি বেশি বাণিজ্য সংলাপের আয়োজন করতে হবে।

অনুষ্ঠানের আরেক বিশেষ অতিথি তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী রুশার পেকান বলেন, ডি-৮ হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার এক অমিত জোট। এর প্রতিটা অর্থনৈতিক সুযোগই তৈরি করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

অতিথিদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ভাইস মিনিস্টার (ট্রেড) জেরি সামবুয়াগা বলেন, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দরকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব। আর এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির পারস্পরিক সহযোগিতা তো লাগবেই।

ডি-৮-এর সেক্রেটারি জেনারেল রাষ্ট্রদূত দাতো কো জাফারি কো শাহারি বলেন, সারা বিশ্বই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ডি-৮-এর সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতার প্রতিজ্ঞা মহামারি কোভিডের কারণে সৃষ্ট সংকটগুলো মোকাবিলা করতে পারবে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর, ইরান ও নাইজেরিয়া– এই আট দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এইট (ডি-৮)। ১৯৯৭ সালের জুনে ইস্তাম্বুল ঘোষণার মাধ্যমে এই ডি-৮ যাত্রা শুরু করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা, পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করাই ছিল এ সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ফোর্বসের তালিকায় বাংলাদেশের দুই নারী

বিশ্বখ্যাত সাময়িকী *ফোর্বস*-এর থার্টি আন্ডার থার্টি তালিকায় বাংলাদেশে যে নয় জন তরুণ স্থান পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছেন দুইজন নারী। তারা হলেন– শমী হাসান চৌধুরী ও রিজভানা হৃদিতা। সামাজিক প্রভাব শ্রেণিতে তারা এ স্থান পেলেন।

রিজভানা হৃদিতা ও শমী হাসান চৌধুরী

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজারো মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অথচ একটু সচেতন হলেই এবং স্বাস্থ্যবিধি মানলেই ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। একদিনের ডায়রিয়ায় মাকে হারানো শমী হাসান তাই দরিদ্র, অশিক্ষিত পরিবারগুলোকে সচেতন করতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় গড়ে তোলেন সেবামূলক সংস্থা 'অ্যাওয়ারনেস ৩৬০'। বর্তমানে বিশ্বের ২৩টি দেশের ১ হাজার ৫০০ তরুণ এ সংস্থার উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করছেন।

প্রযুক্তির মাধ্যমে 'হাইড্রোকুপ্লাস' পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে তথ্য দেয়, কাজ করে পানির অপচয় রোধে। সাধারণভাবে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করতে ল্যাবে বোতলে করে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করতে এক-দুই সপ্তাহ লেগে যায়। হাইড্রোকুপ্লাস সেখানে এক মিনিটের কম সময়ে ফল জানিয়ে দেয়। এটি নিয়ে কাজ করেই রিজভানা হৃদিতা স্থান পেয়েছেন থার্টি আন্ডার থার্টিতে।

বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে বেশি

বাংলাদেশের নারীদের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৭৫ বছর। আর পুরুষের গড় আয়ু ৭১ বছর। অর্থাৎ এদেশে পুরুষের চেয়ে নারীর গড় আয়ু চার বছর বেশি। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) প্রকাশিত তাদের নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২১'-এ এই তথ্য জানিয়েছে। এবারের প্রতিবেদনে নারীর শরীরের ওপর নারীর অধিকারকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন নারীর তার নিজের শরীরের ওপর কতটা নিয়ন্ত্রণ আছে তার ওপর নির্ভর করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার কতটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার হিসাবসহ নারী শিক্ষা ও অধিকারের পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

মহাকাশে প্রথম আরব নারী নোরা মাতরোশি

প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশে যাত্রার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের নোরা আল মাতরোশি। সম্প্রতি অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে মহাকাশ প্রকল্প বিস্তৃত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে নারী নভোচারী নির্বাচন করল উপসাগরীয় এ দেশটি।

২৭ বছর বয়সি নোরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক শেষ করে একটি কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। এ বছরই তিনি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসায় প্রশিক্ষণ শুরু করবেন। ৪ হাজার ৩০০ আবেদনকারীর মধ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

লকডাউনে কর্মহীন পরিবার পাবে ৫০০ টাকা

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে ১৪ই এপ্রিল থেকে সরকার সারা দেশে সর্বাত্মক লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে। লকডাউন চলাকালীন কর্মহীন প্রতিটি পরিবারকে নগদ ৫০০ টাকা এবং লকডাউন বাড়লে কর্মহীন প্রতিটি পরিবারকে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপণ্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সরকার ইতোমধ্যে কর্মহীন পরিবারের জন্য ৫৭২ কোটি ৯ লাখ ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। যা এরই মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পৌঁছে গেছে। তবে, কঠোর লকডাউন সাত দিনের বেশি বাড়লে প্রতিটি কর্মহীন পরিবারকে দেওয়া হবে খাবারের প্যাকেট। এর মধ্যে থাকবে ১০ কেজি চাল, এক কেজি তেল, এক কেজি ডাল, চার কেজি আলু, এক কেজি লবণ। সহায়তার এই সব পণ্য প্যাকেটে জনপ্রতিনিধিরা পৌঁছে দেবেন নিজ নিজ এলাকার তালিকাভুক্ত কর্মহীন পরিবারে। সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে, প্রায় এক কোটি ২৪ লাখ ৪১ হাজার ৯০০ পরিবারকে ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) কর্মসূচির আওতায় এ আর্থিক সহায়তা দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পরিবার প্রতি ৪৫ টাকা কেজি দরে ১০ কেজি চালের সমমূল্য, অর্থাৎ কার্ড প্রতি ৪৫০ টাকা হলেও ৫০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে ৫০০ টাকা হারে, যা পাবে কর্মহীন প্রতিটি পরিবার। এটি করোনাকালীন প্রথম উদ্যোগ।

নাটোর শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ৩০শে এপ্রিল ২০২১ জেলার ৩০০ অসচ্ছল পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়– পিআইডি

জানা গেছে, দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলার জন্য ৮৭ লাখ ৭৯ হাজার ২০৩টি কার্ড এবং ৩২৮টি পৌরসভার জন্য ১২ লাখ ৩০ হাজার ৭৪৬টি কার্ডসহ মোট এক কোটি ৯ হাজার ৯৪৯টি ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে ৪৫০ কোটি ৪৪ লাখ ৭৭ হাজার ৫০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোভিড পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সহায়তার জন্য ১২১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৬৪টি জেলার ৪ হাজার ৫৬৮টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা হারে মোট ১১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা মানবিক সহায়তা দেওয়া হবে।

ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জন্য ৭ লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেট সিটি করপোরেশনের জন্য ৫ লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সারা দেশের ৩২৮টি পৌরসভার অনুকূলে মোট ৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে 'এ' ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য ২ লাখ টাকা, 'বি' ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য এক লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং 'সি' ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য এক লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ধান-চাল সংগ্রহ করছে সরকার

সরকার চলতি বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ঘোষণা অনুযায়ী সরকার সাড়ে ৬ লাখ টন ধান এবং ১১ লাখ টন চাল সংগ্রহ করবে। কেজি প্রতি ২৭ টাকা দরে ধান কিনবে কৃষকের কাছ থেকে, আর কেজি প্রতি ৪০ টাকা দরে ১০ লাখ টন সিদ্ধ চাল এবং ৩৮ টাকা দরে দেড় লাখ টন আতপ চাল কিনবে চালকল মালিকদের কাছ থেকে। ২৮শে এপ্রিল থেকে ধান এবং ৭ই মে থেকে চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়ে তা চলবে আগস্ট পর্যন্ত।

চলতি বোরো মৌসুমে সরকারের চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ৫ লাখ টন নির্ধারিত হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে কৃষিমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, অনুকূল আবহাওয়া, গত বছরের তুলনায় ১ লাখ ২০ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমিতে বোরো ধানের চাষ হওয়া এবং একইসঙ্গে গত বছরের তুলনায় ৩ লাখ হেক্টরেরও বেশি জমিতে হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ বাড়ায় গতবারের তুলনায় এবার বোরোর উৎপাদন ৯ থেকে ১০ লাখ টন বেশি হবে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, গত বছর বোরো চালের উৎপাদন ১ কোটি ৯৪ লাখ টনে দাঁড়িয়েছিল।

আগাম জাতের ধানের চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, হাওরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান হয়, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ধান কোনো কোনো বছর আগাম বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এ ঝুঁকি কমাতে আমরা কাজ করছি। ১৫-২০ দিন আগে পাকে এমন জাতের ধান চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শ্রমিক সংকটের কথা চিন্তা করে, দ্রুততার সাথে ধান কাটার জন্য হাওরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার দেওয়া হচ্ছে। ২৫শে এপ্রিল কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার হাওরে 'বোরো ধান কর্তন উৎসব' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি। মিঠামইন উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পরে কৃষিমন্ত্রী ধান কাটার উদ্‌বোধন করেন ও ধান কাটার যন্ত্র 'কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার' কৃষকের মাঝে বিতরণ করেন।

কৃষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, হাওরের বিস্তীর্ণ জমিতে বছরে মাত্র একটি ফসল বোরো ধান হয়। এ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে উচ্চফলনশীল জাতের ধান যেমন ব্রি-ধান ৮৯, ৯২ উদ্ভাবন করেছে। সরকার এসব উন্নত জাতের হাইব্রিড ধানের বীজ সরবরাহ করবে। এগুলো চাষে কৃষকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরো বলেন, হাওরে চাষযোগ্য জাতের ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য হাওরে 'ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের' আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকবান্ধব। আজকে দিগন্তবিস্তৃত হাওরে সোনার ধানের যে অপরূপ হাসি দেখা যাচ্ছে, দেশের কৃষকের মুখেও সে রকম অমলিন হাসি ধরে রাখতে চায় সরকার। সেজন্য কৃষিকে লাভবান ও কৃষকের জীবনমান উন্নত করতে সরকার কৃষকদেরকে সার, বীজ, সেচসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমানো ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে ৭০% ভর্তুকিতে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ বিভিন্ন যন্ত্র কৃষকদেরকে দিচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৫শে এপ্রিল ২০২১ কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার হাওরে বোরো ধান কর্তন উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে। কৃষিপণ্য রপ্তানিকে আরো ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করতে রপ্তানিতে যেসকল বাধা ও সমস্যা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করা হবে। মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ১১ই এপ্রিল সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে শাকসবজি ও ফল রপ্তানিকারকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে সরকারের এখন লক্ষ্য হলো কৃষির প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করে কৃষিকে লাভজনক করা। এজন্য কৃষিপণ্যের রপ্তানি আরো বাড়াতে হবে। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তাদের আরো কীভাবে সহায়তা দেওয়া যায়, সেটা আমরা চিন্তা করছি। উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কীভাবে যেতে পারে, সরকার এর ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য যারা রপ্তানির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং মান উন্নয়নে কাজ করছে তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব অনেক বেশি। কৃষি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একই সাথে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালেরও জোগান দিয়ে থাকে। এ কাঁচামাল জোগান দিয়ে আমরা যে প্রক্রিয়াজাত পণ্য পাচ্ছি সেটা বিদেশে রপ্তানিরও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এখনো আমাদের রপ্তানিটা বেশির ভাগ তৈরি পোশাকের মধ্যে সীমিত। প্রায় শতকরা ৮০-৮৪ ভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। তার সাথে সাথে কৃষি একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর। আমরা যদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারি এবং নিরাপদ সবজি ও ফলের নিশ্চয়তা দিতে পারি, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারেও কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে পারব।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্ব নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর চার পরামর্শ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক দুই দিনব্যাপী 'লিডারস সামিট'-এর উদ্‌বোধনী সেশনে ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের চার পরামর্শ দেন। ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যার পর এই সামিট অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সম্মেলনের (ভার্চুয়াল) উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জন বিশ্ব নেতাকে এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান জো বাইডেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম পরামর্শ হলো– বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম রাখতে উন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে তাদের তাৎক্ষণিক ও উচ্চাভিলাষী অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও প্রশমন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হতে হবে। দ্বিতীয় পরামর্শ হলো– বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১০০ মার্কিন ডলার তহবিল নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে এপ্রিল ২০২১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি Joe Biden আয়োজিত জলবায়ু সম্পর্কিত Leaders' Summit on Climate-এ ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিলের ৫০ শতাংশ অভিযোজন ও ৫০ শতাংশ প্রশমনের জন্য কাজে লাগানো। তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে– উদ্ভাবন এবং জলবায়ু অর্থায়নে (concessional climate financing) বড়ো অর্থনীতির দেশ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সেক্টরগুলোকে এগিয়ে আসা। চতুর্থ পরামর্শ হলো– সবুজ অর্থনীতি এবং কার্বন নিরপেক্ষ প্রযুক্তিতে ট্রান্সফার হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বৈশ্বিক সংকট শুধু সবার সম্মিলিত দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমেই মোকাবিলা করা যেতে পারে। সম্মেলন আয়োজনের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে আসা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার আগ্রহকে বাংলাদেশ প্রশংসা করে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অভিযোজন এবং প্রশমনে বিশ্বে বাংলাদেশের সফলতার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ জলবায়ু অভিযোজন এবং টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে, যা আমাদের জিডিপি'র ২ দশমিক ৫ শতাংশ। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১ দশমিক ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আশ্রয় এবং এর ফলে পরিবেশের ক্ষতির কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষে সারা দেশে ৩০ মিলিয়ন গাছ লাগানোর উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

we`ÿr: we‡kl cwZ‡e`b

বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে বিশেষ গুরুত্ব

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, আসছে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সঞ্চালন ব্যবস্থা টেকসই করতে দ্রুততার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানো আবশ্যক। সঞ্চালনে N-1 বা N-2 নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ৮ই মে প্রতিমন্ত্রী ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স (এফইআরবি) আয়োজিত 'আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০২১-২০২২ : বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্যই আজ বেসরকারি উদ্যোগে ৯১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৯ হাজার ৪৭৩ মেগাওয়াট হয়েছে, যা মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ৪৩ শতাংশ।

খুলনায় ২০০ কোটি টাকার আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইন

খুলনা নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ সরবরাহে ঝুঁকি কমাতে ২০০ কোটি টাকার আন্ডারগ্রাইন্ড বিদ্যুৎ লাইনের প্রকল্প প্রস্তুত করেছে ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)। এরই মধ্যে জিরোপয়েন্ট-গল্লামারী-ময়লাপোতা-শেরে বাংলা সড়কে চার লেন প্রশস্তকরণের কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। ১৫ই মার্চ নগর ভবনে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির 'কেমন খুলনা চাই' অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক চলমান সড়ক প্রশস্তকরণ কাজের সঙ্গে মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের তার নেওয়ার জন্য ওজোপাডিকোকে

প্রস্তাব দেন। এতে সাড়া দিয়ে শেরে বাংলা ও শিপইয়ার্ড সড়কের মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের তার নেওয়ার উদ্যোগ নেয় ওজোপাডিকো। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন বলেন, এতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিদ্যুতের তার ৩৩ কেভি ১১ কেভি বসাতে ব্যয় হবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

wbivc` mok : we‡kl cwZ‡e`b

গণপরিবহণের সংকট নিরসনে ৬০টি বাস দিচ্ছে বিআরটিসি

ঢাকায় গণপরিবহণের তীব্র সংকট নিরসনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) ৬০টি বাস নামাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া সংস্থাটির বাস এবার রাস্তায় সাধারণ যাত্রী চলাচলের জন্য নামানো হচ্ছে।

৪ঠা এপ্রিল থেকে ৬০টি ডাবল ডেকার বাস নগরীর বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে। যেসব রুটে যাত্রী সংখ্যা বেশি এসব রুটকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। মূলত এখন বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ফলে বিআরটিসি'র বাসগুলোও ডিপোতে অলস পড়ে আছে। এসব বাস অতিরিক্ত হিসেবে নগরীতে নামানো হবে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ও সংক্রমণ প্রতিরোধে ১৮ দফা নির্দেশনা জারি করেছে সরকার। বাসসহ সব গণপরিবহণে অর্ধেক আসন খালি রেখে যাত্রী তুলতে বলা হয়েছে নির্দেশনায়। এতে ভাড়া বেড়েছে ৬০ শতাংশ। একইসঙ্গে অফিসে ৫০ শতাংশ উপস্থিতি ঠিকঠাক কার্যকর না হওয়ায় রাস্তায় বেরিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন অফিস যাত্রীরা। ঢাকায় গণপরিবহণের তীব্র এ সংকট নিরসনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) ৬০টি দ্বিতল বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ-শিমরাইল সড়ক উন্মুক্ত

সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইলে ডেমরা-আদমজী ইপিজেড-নারায়ণগঞ্জ সড়কের মাটির নিচে বক্স চ্যানেল নির্মাণ শেষে সড়কটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ২৬শে মার্চ ডিএনডি'র নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আহসানূত তাকবিম চৌধুরী এর উদ্‌বোধন করেন। এসময় প্রজেক্ট কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মো. হাসিব উদ্দিন ও অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনার টিকা উৎপাদন হবে দেশেই

রাশিয়া ও চীনের দুটি করোনার টিকা বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানির মাধ্যমে উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ২৮শে এপ্রিল ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে টিকা উৎপাদনের এ প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শাহিদা আক্তার জানান, রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি এবং চীনের টিকা দেশীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। দেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রাশিয়া ও চীনের ভ্যাকসিন উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

শিশুদের বাঁচাতে ম্যালেরিয়ার টিকা আবিষ্কারের পথে বিশ্ব

ম্যালেরিয়ার নতুন একটি টিকা উদ্ভাবনের পথে অনেক দূর এগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। শিশুদের ওপর টিকাটির পরীক্ষায় এর উচ্চমাত্রার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এই টিকা উদ্ভাবন করেছেন। টিকার সম্ভাব্য নাম দিয়েছেন আর২১/ম্যাট্রিক্স-এম। পরীক্ষামূলক এ গবেষণায় যুক্ত গবেষকেরা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ফলাফলে দেখা গেছে, মশাবাহিত রোগটি থেকে সুরক্ষা দিতে টিকাটি ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত কার্যকর। আফ্রিকার সাড়ে ৪০০ জন শিশুর ওপর এক বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে এ প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট*-এ শিগগিরই এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ১৮ই এপ্রিল ২০২১ মহাখালী ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালের রোগী সেবা কার্যক্রমের উদ্‌বোধন শেষে ঘুরে দেখেন। এসময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

টিকা নিয়ে আক্রান্ত হলেও স্বাস্থ্যঝুঁকি কম

কোভিড-১৯-এর টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পরও অনেকে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অন্যদের তুলনায় অনেক কম। টিকা নেওয়ার পর করোনায় আক্রান্ত ২০০ জনের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ৮৮ শতাংশের বেশি রোগীর শ্বাসকষ্ট ছিল না। আর ৯২ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন লাগেনি।

গবেষণাটি করেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) একদল গবেষক। ৭ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত এই গবেষণা চালানো হয়। গবেষণার নেতৃত্বে থাকা উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম বুদ্ধ দাশ বলেন, প্রথম ডোজ টিকা গ্রহণকারীরা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হলেও যারা টিকা গ্রহণ করেননি তাদের তুলনায় স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই বললেই চলে। তাদের মৃত্যুঝুঁকিও কম।

মাস্ক না পরলে সংক্রমণ ঝুঁকি আড়াই গুণ বেশি

সঠিকভাবে যারা মাস্ক ব্যবহার করেন না তাদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আড়াই গুণ বেশি। ২৬শে এপ্রিল সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাস্কের ব্যবহার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কায়ও কমতে থাকে। ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিলের মধ্যে ১৪৮ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী এবং ২৪৫ জন সুস্থ (নেগেটিভ) মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যারা বাসার বাইরে কখনো মাস্ক ব্যবহার করেন না তাদের আক্রান্ত হওয়ার হার শতভাগ। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন আটলান্টার সহযোগিতায় ফিল্ড এপিডেমিওলজি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, বাংলাদেশের প্রশিক্ষণার্থীরা এ গবেষণাটি করে।

দেশে অনুমোদন পেল চীনের টিকা

এবার চীনের প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মার তৈরি টিকার জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ নিয়ে সরকার করোনার তিনটি টিকার অনুমোদন দিল। ২৯শে এপ্রিল সিনোফার্মার টিকার অনুমোদন দেয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জানুয়ারি মাসে প্রথম ব্যবহারের অনুমোদন দেয় অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকা। এরপর এ মাসেই অনুমোদন দিয়েছিল রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি। অধিদপ্তর বলছে, রাশিয়ার টিকা ৬০টির বেশি দেশে ব্যবহার হচ্ছে। আর চীনের টিকাটি ব্যবহার হচ্ছে ৩৫টি দেশে।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ফেনী নদীর ওপর মৈত্রী সেতুর উদ্‌বোধন

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তে ফেনী নদীর ওপর মৈত্রী সেতু উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ৯ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই সেতুর উদ্‌বোধন করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে প্রথম কোনো নদী সেতু উদ্‌বোধন হলো। ফেনী নদীতে এই সেতুর নাম রাখা হয়েছে 'মৈত্রী সেতু'। একইসঙ্গে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার সাবরুমে একটি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ফেনী সেতুর দৈর্ঘ্য ১ দশমিক ৯ কিলোমিটার। এটা রামগড়ের সঙ্গে ভারতের ত্রিপুরার সাবরুমে যুক্ত হয়েছে। ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়েস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এই সেতু নির্মাণ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এই সেতু দিয়ে সহজেই ত্রিপুরাসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাবসাবাণিজ্য সহজ হবে।

বিমানের নতুন উড়োজাহাজ 'শ্বেতবলাকা'

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নতুন উড়োজাহজ 'শ্বেতবলাকা'। তৃতীয় ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজটি বিমান বহরে যুক্ত হওয়ার পর উড়োজাহাজের সংখ্যা দাঁড়াল ২১। ৫ই মার্চ রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে উড়োজাহাজটি। গণমাধ্যমে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা তানবীর আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে কানাডার উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডি হ্যাভিল্যান্ড থেকে ড্যাশ-৮-৪০০ মডেলের উড়োজাহাজটি বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেয়। নতুন এই উড়োজাহাজের নাম 'শ্বেতবলাকা'

রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর উড়োজাহাজটিকে ওয়াটার ক্যানন স্যালুট দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এসময় বিমান প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এমডিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের মধ্যে জিটুজি ভিত্তিতে কেনা তিনটি ড্যাশ-৮ প্লেনের প্রথমটি গত বছরের ২৭শে ডিসেম্বর ও দ্বিতীয় উড়োজাহাজটি গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিমান বহরে যুক্ত হয়। বর্তমানে বিমানের বহরে মোট উড়োজাহাজের সংখ্যা ২০টি। এর মধ্যে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯, ছয়টি বোয়িং ৭৩৭ এবং চারটি ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে আরো ৩৫ হাজার আধুনিক শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে আইসিটি শিক্ষায় নিজেদের দক্ষ করে তুলতে উৎসাহিত হবে। তিনি বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পাস শিক্ষার্থীদের আইটিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশের ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মেন্টরিং, কোচিং ও মনিটরিং-এর জন্য সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী ২২শে এপ্রিল 'ইন্টারন্যাশনাল আইসিটি গার্লস ডে' উপলক্ষে এটুআই, গ্রামীণফোন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানমুখী, দক্ষতানির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তি, সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তা না হলে তারা পিছিয়ে পড়বে।

বিশ্বব্যাংক দিচ্ছে ২৫০ মিলিয়ন ডলার

দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ২৫০ মিলিয়ন ডলার বা ২৫ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এলক্ষ্যে ২২শে এপ্রিল বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে 'থার্ড প্রাগমেটিক জবস ডেভেলপমেন্ট পলিসি ক্রেডিট (ডিপিসি-৩)'-বিষয়ক একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন ও বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেমবন নিজ নিজ পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরিসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বা সংস্থার সংশ্লিষ্টতায় কিছু সহায়ক নীতিকৌশল ও বিধিবিধান সংস্কার এবং আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রস্তাবিত সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মোট তিন বছরে ৭৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত হয়। এর আওতায় শেষ কিস্তির জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর হলো। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো বিনিয়োগ ও ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিবেশ আধুনিকায়ন, শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান ও অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষমতা জোরদারকরণের পাশাপাশি দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন

পঁচিশে বৈশাখ ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দ। বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের এই পঁচিশে বৈশাখে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কালজয়ী এ কবি।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সংগীত রচয়িতা, গায়ক ও চিত্রশিল্পী। সৃষ্টিশীলতার সমান্তরালে তিনি ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজভাবনা সবকিছু সমানভাবে চালিয়ে গেছেন। বিশ্বভারতী তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের অন্যমত প্রধান কীর্তি। তিনি বিশ্বসাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের একজন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে যাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য পায় নতুন রূপ।

দেশের বর্তমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে কবির জন্মদিনের কোনো আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়নি। তবে বেতার ও টেলিভিশনে কবির স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছায়ানট এবারের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে 'ধর নির্ভর গান' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ দিবসকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রবীন্দ্র চেতনার আলোকে সাম্য ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় করার প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকীতে।

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা ও বাঙালির অহংকার। কবিগুরুর জীবনাদর্শ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে– এ আমার প্রত্যাশা।

সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯১৩ সালে তাঁর নোবেল বিজয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এনে দেয় গৌরবের মুকুট। এশিয়ার মধ্যে সাহিত্যে নোবেল পাওয়া তিনি প্রথম লেখক।

সবশেষে বলতে হয়, রবি ঠাকুরের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হোক বা না হোক ২৫শে বৈশাখ মানেই রবীন্দ্রনাথ, ২৫শে বৈশাখ মানেই বাঙালির আপনজনকে আরো একবার ফিরে দেখা তাঁরই আলোয়। শুভ জন্মদিন রবি ঠাকুর।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি অনুদানের সিনেমা K\KZ\oq\

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের গল্প অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র *কাকতাড়ুয়া*। এটি সরকারি অনুদানে নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছে দেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী মাজেদ চৌধুরীর ছেলে মুহিত চৌধুরী। এছাড়াও অভিনয় করেছেন– জামিলুর রহমান শাখা, শাহনূর, ইলোরা গহর, রেবেকা, নাজমুল, আহমেদ শরীফসহ আরো অনেকে। *কাকতাড়ুয়া* চলচ্চিত্রের পরিচালক ফারুক হোসেন।

সার্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে g\vq\

শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হয়েছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর চলচ্চিত্র নিয়ে 'সার্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। ৪ঠা মে থেকে ৯ই মে অনুষ্ঠিত হয় এই ফেস্টিভ্যাল। বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেছে দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক ড. মাসুদ পথিকের

মায়া : দ্য লস্ট মাদার চলচ্চিত্রটি। ফিচার ফিল্ম প্রতিযোগিতা বিভাগে মাসুদ পথিক পরিচালিত *মায়া : দ্য লস্ট মাদার* চলচ্চিত্রটি প্রতিযোগিতা করে। এই চলচ্চিত্রটি বীরাঙ্গনা এবং যুদ্ধশিশুর সত্য কাহিনির ওপর নির্মিত। উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রটি ট্যাগোর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'বেস্ট ন্যারোটিভ ফিচার ফিল্ম' পুরস্কারও পেয়েছিল। কবি কামাল চৌধুরীর 'যুদ্ধশিশু' কবিতা এবং বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের চিত্রকর্ম 'ওমেন'-এর অবলম্বনে নির্মিত হয় এ চলচ্চিত্রটি।

প্রতিবেদন : মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

চট্টগ্রামের মাদক মাফিয়াদের তালিকা হচ্ছে

বৃহত্তর চট্টগ্রামের মাদক মাফিয়াদের তালিকা তৈরি করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। পৃষ্ঠপোষক, অর্থলগ্নিকারী, গডফাদারসহ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে তৈরি হচ্ছে এ তালিকা। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের মাদক চক্রের হোতাদের ২ হাজারের বেশি জনের একটি খসড়া তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় ওই তালিকা চূড়ান্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। জানা যায়, মাদকের পৃষ্ঠপোষক, অর্থলগ্নিকারী, গডফাদার ও বিক্রেতাদের আলাদা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ওই খসড়া তালিকায় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি মাদক ব্যবসায়ী, যাতে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে প্রায় ৪০০ জনের মতো। পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় আছেন– রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত সহকারী, তাদের ছেলে, ভাই ও নিকটাত্মীয়রা। অর্থলগ্নিকারী হিসেবে রয়েছেন– বিভিন্ন শিল্প-কারখানার মালিক, গার্মেন্ট ব্যবসায়ী, আমদানি-রপ্তানিকারক ও কয়েকজন প্রবাসী ব্যবসায়ী। গডফাদার তালিকায় রয়েছেন– স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দলের নেতা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। তালিকা তৈরির সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, সবশেষ তৈরি করা তালিকার সঙ্গে সমন্বয় করেই মাদকের এ তালিকা তৈরি হয়েছে। ইতিপূর্বে বন্দুকযুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন, যারা মারা গেছেন কিংবা মাদক ব্যাবসা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে নতুন করে ব্যাবসায় নামা, পৃষ্ঠপোষকতাকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৃহত্তর চট্টগ্রামের তিন শতাধিক ব্যবসায়ীর নাম স্থান পায় ওই তালিকায়।

৯০ লাখ টাকার হেরোইন উদ্ধার

সাভারে একটি পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাকে অভিযান চালিয়ে ৯০ লাখ টাকা মূল্যের ৮৮০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র‍্যাব। ১লা এপ্রিল রাতে আমিনবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় হেরোইন বহনকারী ট্রাকটি জব্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করে সাভার থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং জব্দ করা হয় মাদক কারবারিতে ব্যবহৃত ট্রাকটি।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ি জলে বৈসাবির ফুল

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়িদের প্রধান সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব বৈসাবি। ১২ই এপ্রিল ভোরে চেঙ্গী নদীসহ বিভিন্ন প্রবাহমান ছড়াখালে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে চাকমাদের 'ফুল বিজু' উদ্‌যাপিত হয়। চাকমা জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ বিভিন্ন বয়সিরা খাগড়াছড়ির চেঙ্গী নদীসহ বিভিন্ন ছড়াখালে ফুল দিয়ে উপগুপ্ত বুদ্ধের উদ্দেশে পূজা করেন। অনেকে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দেন। ফুল ভাসাতে আসা কিশোরী চম্পা চাকমা বলেন, আমাদের এবার ফুল বিজুর প্রধান প্রার্থনা ছিল করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি লাভ করা। এছাড়াও পুরনো বছরের দুঃখ-গ্লানি ভুলে নতুন বছরে ভালো কিছু প্রত্যাশা করছি। সমাজকর্মী নিপু চাকমা বলেন, মহামারির কারণে গেল বছর ফুল বিজুও করতে পারিনি।

এবার অন্তত সীমিতভাবে নদীতে ফুল ভাসাতে পেরে খুশি লাগছে। চৈত্রের শেষ দুই দিন ও বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন 'বিজু' উৎসব পালন করেন চাকমারা। ১২ই এপ্রিল 'ফুল বিজু', ১৩ই এপ্রিল 'মূল বিজু' এবং নববর্ষের দিন 'গয্যাপয্যা'। অন্যদিকে, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী চৈত্র সংক্রান্তির দিনে 'হারি বৈসু', পহেলা বৈশাখ 'বৈসুমা' এবং নববর্ষের দ্বিতীয় দিন 'বিসিকাতাল' নামে বর্ষবরণ ও বর্ষ বিদায় উৎসব করে। আর মারমা জনগোষ্ঠী বাংলা নববর্ষের দিন থেকে তিন দিন ধরে সাংগ্রাই উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে গত বছরের মতো এ বছরও ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী 'গরয়া' নৃত্য এবং মারমাদের জলকেলি বা 'পানি ছিটানো উৎসব' হচ্ছে না। ত্রিপুরাদের বৈসুমা, মারমাদের সাংগ্রাই এবং চাকমাদের 'বিজু' উৎসবের আদ্য অংশ মিলিয়ে একসাথে 'বৈসাবি' উৎসব নাম দেওয়া হয়েছে।

বান্দরবান সদর হাসপাতালে চালু হচ্ছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট

করোনা রোগীদের জরুরি প্রয়োজনে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দেশের ৬২টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য জেলা বান্দরবানের সদর হাসপাতালে শেষ হয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট-এর কাজ। ১৩ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং প্রধান অতিথি থেকে এর উদ্‌বোধন করেন।

হাসপাতালে ভর্তিকৃত জটিল রোগীদের সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সরবরাহ করার লক্ষ্যে বান্দরবান সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শেষ হয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর কার্যক্রম। বিশেষ করে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন হয় সার্বক্ষণিক অক্সিজেনের, কিন্তু বান্দরবান সদর হাসপাতালে অক্সিজেনের পর্যাপ্ত মজুত না থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার কারণে বেশিরভাগ সময়ই করোনা রোগী ও জটিল রোগীদের চট্টগ্রাম বা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হতো। তবে এবার বান্দরবান সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ৩ কোটি ২৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয়ে বসানো হচ্ছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট। আর এই প্ল্যান্ট থেকে পাইপের মাধ্যমে পুরো হাসপাতালে ১শ শয্যায় অক্সিজেন সরবরাহ করার মাধ্যমে রোগীদের সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সরবরাহ করার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

wkï I wK‡kvi Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনে সরকারের অনুমোদন

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হলে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন ও সনদ নিতে হবে– এমন বিধান রেখে একটি বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। ডে-কেয়ার থেকে শিশু হারিয়ে গেলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইন পাস হওয়ার পর অনুমোদন ছাড়া কেউ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবে না। অনুমোদন ও নিবন্ধন ছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালালে ২ বছরের জেল ও ১০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে খসড়ায়। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৩রা এপ্রিল জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিল ২০২১' সংসদে উত্থাপন করেন।

আগামী দুই মাসের মধ্যে বিলটি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হবে। এ আইন হলে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজ ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত শ্রেণির কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার নিবন্ধন সনদ নিয়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবে। যেসব শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এখন পরিচালিত হচ্ছে, নতুন আইন পাস হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সেগুলোকে নিবন্ধন নিতে হবে। তখন সব শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসবে।

বিলে বলা হয়েছে, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটালে, তাতে সহায়তা করলে বা তথ্য গোপন করলে ৬ মাসের কারাদণ্ড বা ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। এছাড়া শিশু এবং ক্ষেত্রমতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিনোদন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও শিশুর অনুকূল পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি ৩ মাসে একবার শিশুর অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে হবে।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনলাইন চাকরি মেলা

দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনলাইন চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয় ২৭-২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত। এ মেলায় সারা দেশের প্রতিবন্ধীরা অংশগ্রহণ করেন। ইনোভেশন টু ইনক্লুশন (আইটুআই) প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) সমর্থিত, বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক (বিবিডিএন), লিওনার্ড চ্যাশায়ার এবং সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটির (সিএসআইডি) সহযোগিতায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরির মেলা চলে।

i2i
Innovation to Inclusion

এ মেলায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২০টি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান চাকরির মেলায় অংশ নেয়। সেইসঙ্গে ৩৫টি বিভাগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার কথাও জানান এসব প্রতিষ্ঠান। ২৭-২৯শে এপ্রিলের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীরা অনলাইন চাকরি মেলায় লগ ইন করতে সক্ষম হন। চাকরিপ্রার্থীরা তাদের মুঠোফোন নম্বর দিয়ে https://i2ijobfair.skyfair.live/–এই লিংকের মাধ্যমে প্রথমে অনলাইন নিবন্ধন করেন। এরপর আগ্রহী চাকরিপ্রার্থীরা সিভির পিডিএফ সংস্করণগুলো তাদের পছন্দসই চাকরির জন্য নিয়োগকর্তাদের কাছে জমাদান করেন। এ মেলা ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশে প্রথম ভার্চুয়াল চাকরি মেলা, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই চাকরি মেলার লক্ষ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরির জোগানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজ প্রবেশগম্যতা প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী মানুষের কাজের সুযোগ বাড়াতে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের প্রজ্ঞাপনে অর্থ আইন সেশন ৫২(৬)-এ বলা হয়েছে, কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কর্মরত মোট জনবলের ন্যূনতম ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে ওই করদাতাকে প্রদেয় ৫ শতাংশ কর রেয়াত দেওয়া হবে।

শেরপুরে ১৩৭টি প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা

শেরপুর সদর উপজেলার ১৩৭টি প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহায়তা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ২৮শে এপ্রিল শেরপুর কালেক্টরেট স্কুল প্রাঙ্গণে করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও দুস্থদের মাঝে 'প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা'

কর্মসূচির আওতায় এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত মানবিক সহায়তা সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, লবণ ও আলু।

প্রতিবন্ধীরা হবে আগামী দিনের উদ্যোক্তা

দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে একসাথে কাজ শুরু করেছে ধামাকাশপিং ডটকম ও ডিজঅ্যাবলড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনস (ডিআরআরএ)। ২১শে এপ্রিল ধামাকার কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনলাইন অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা চুক্তিস্বাক্ষর হয়েছে। সমঝোতা চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হয়েছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান। মন্ত্রী ধামাকা এবং ডিআরআরএ-এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এরকম মহতী কাজের সাথে যুক্ত থাকাটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করি এই উদ্যোগে সবাই আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে এই উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিফলন। প্রতিবন্ধীরা ধামাকার এই অ্যাপটি ব্যবহার করে অচিরেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

চট্টগ্রামে চারশ প্রতিবন্ধী পেল খাদ্য সামগ্রী

চট্টগ্রাম নগরীর চারশ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীর মাঝে সরকারি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা প্রশাসন। করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকানোর লক্ষ্যে লকডাউনের মধ্যে ২২শে এপ্রিল নগরীর কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আসম জামশেদ খোন্দকার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন, আমরা চাই এই পরিস্থিতিতে কেউ অনাহারে ও কষ্টে থাকবে না। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আশরাফুল হাসান, এনডিসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ রানা, জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা সজীব চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রতিবেদন : অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকাপে ফাইনালে বাংলাদেশ

বিশ্বকাপ আরচারির রিকার্ভ মিশ্র দলগত ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছেন রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকী। ২০শে মে সুইজারল্যান্ডের লুজানে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে তারা ৫-৩ সেটে কানাডাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। এর আগে ১/১২-এর খেলায় ৫-৩ সেট পয়েন্টে ইরানকে এবং ১/৮-এর খেলায় ৫-১ সেট পয়েন্টে জার্মানিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন রোমান সানা ও দিয়া। কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনকে ৫-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন বাংলাদেশের দুই তীরন্দাজ।

তিন ধাপ এগোলেন তামিম ইকবাল

আইসিসি'র টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ এগিয়েছেন তামিম ইকবাল। উন্নতি হয়েছে মুশফিকুর রহিম ও মুমিনুল হকেরও। শ্রীলংকা-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট ও পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে প্রথম টেস্টের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে ৫ই মে সাপ্তাহিক র‍্যাংকিংয়ের হালনাগাদ প্রকাশ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। পাল্লেকেলেতে ড্র হওয়া প্রথম টেস্টে ৯০ ও অপরাজিত ৭৪ রান করে র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে ৩০ নম্বরে উঠেছিলেন তামিম। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে আউট হন ৯২ রানে, দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ২৪ রান। এই পারফরম্যান্সে র‍্যাংকিংয়ে ২৭তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

১৭২০ ক্রিকেটারের জন্য দুই কোটি টাকা

কোভিড-১৯ মহামারির দরুন ক্ষতিগ্রস্ত ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১লা মে বিসিবি তাদের বর্তমান চুক্তির বাইরে থাকা ১৭২০ জন ক্রিকেটারের মাঝে দুই কোটি টাকা বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে খেলা ক্রিকেটার ছাড়াও জাতীয় নারী ক্রিকেট দল, ইমার্জিং ও অনূর্ধ্ব-১৯, প্রিমিয়ার এবং প্রথম বিভাগ নারী লিগের খেলোয়াড়রা অর্থ সহায়তার আওতায় রয়েছেন।

১৮৬ উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম

দেশের ১৮৬ উপজেলায় ১৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৪ঠা মে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এই প্রকল্প অনুমোদন হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এর আগে ১২৫ উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

না খেলেও র‍্যাংকিংয়ে সাবিনা খাতুনরা

আবারও ফিফা র‍্যাংকিংয়ে প্রবেশ করলেন সাবিনা খাতুন, মারিয়া মান্দারা। ১৬ই এপ্রিল ঘোষিত সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ে তাদের অবস্থান ১৬৭ দেশের মধ্যে ১৩৭তম। জাতীয় নারী ফুটবল দলের খেলা না থাকায় গত বছর ডিসেম্বরে ঘোষিত র‍্যাংকিংয়ে ছিলেন না লাল-সবুজের মেয়েরা। এর আগে ২০২০ সালের ১৪ই আগস্ট ঘোষিত ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ১৩৪তম ছিল। আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলেও ফের ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ফিরল বাংলাদেশ। জানা গেছে, নিয়ম বদলেছে ফিফা। আগে ১৮ মাস আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেললে র‍্যাংকিংয়ের বাইরে চলে যেত যে-কোনো দেশ। এখন নিয়মটা বদলে করা হয়েছে ৪৮ মাস। যে কারণে ফের র‍্যাংকিংয়ে ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে কিংবদন্তি অভিনেত্রী কবরী

আফরোজা রুমা

'মিষ্টি মেয়ে' খ্যাত কিংবদন্তি নায়িকা সারাহ বেগম কবরী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৬ই এপ্রিল ২০২১ মহাখালীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

কবরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৯শে জুলাই চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রাম মহানগরে। চলচ্চিত্রের সোনালি যুগে ষাট ও সত্তরের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা কবরীর পারিবারিক নাম মিনা পাল। বাবা কৃষ্ণদাস পাল এবং মা লাবণ্যপ্রভা পাল। ১৯৬৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি নৃত্যশিল্পী হিসেবে মঞ্চে কাজ শুরু করেন। আর ১৯৬৪ সালে ১৪ বছর বয়সে সুভাষ দত্তের *সুতরাং* ছবির মধ্য দিয়ে সিনেমায় ঝলমলে ভুবনে তাঁর পথচলা শুরু। চলচ্চিত্রটি তাশখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং ১৯৬৫ সালে ফ্রাঙ্কফুট চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়। ১৯৬৮ সালে *সাত ভাই চম্পা* সিনেমার সফলতায় তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ঐ বছরই *আবির্ভাব* চলচ্চিত্রের নায়করাজ রাজ্জাকের সঙ্গে জুটিবদ্ধ হয়ে অভিনয় শুরু করেন। *ময়নামতি* (১৯৬৯), *নীল আকাশের নিচে* (১৯৬৯), *ক খ গ ঘ ঙ* (১৯৭০), *দর্পচূর্ণ* (১৯৭০), *কাচ কাটা হীরে* (১৯৭০), *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০), *স্মৃতিটুকু থাক* (১৯৭১), *রংবাজ* (১৯৭৩) ইত্যাদি চলচ্চিত্রের ধারাবাহিক সফলতায় দর্শকপ্রিয় জুটির তকমা পায় রাজ্জাক-কবরী জুটি। পরে ফারুকের সঙ্গে *সুজন সখী* (১৯৭৫) ও *সারেং বৌ* (১৯৭৮) ছবির সফলতায় এদেশের চলচ্চিত্রের অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন কবরী। আর সেই থেকেই কবরী-ফারুক জুটি সিনেমার রুপালি পর্দায় একটি অনন্য ও জনপ্রিয় জুটির কাতারে উন্নীত হয়। অভিনয়ে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সম্মাননাসহ দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও ছয়টি বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন কবরী। ২০১৯ সালে *বাংলাদেশ প্রতিদিন* তাঁকে আজীবন সম্মাননা দেয়। *লালন ফকির* চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ১৯৭২ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন তিনি। এরপর সাহিত্যনির্ভর *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর রাজার ঝি চরিত্রে ১৯৭৩ সালে এবং *সারেং বৌ* চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ১৯৭৮ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া *সুজন সখী* (১৯৭৫) ও *দুই জীবন* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য আরো দুটি বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁর অভিনীত *তিতাস একটি নদীর নাম* ও *সাত ভাই চম্পা* চলচ্চিত্র দুটি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সেরা ১০ বাংলাদেশি চলচ্চিত্র তালিকায় যথাক্রমে প্রথম ও দশম স্থান লাভ করে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামে চলে যান তিনি। এরপর কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন কবরী। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের টিকিটে ২০০৮ সালে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালে অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই *স্মৃতিটুকু থাক*।

১৭ই এপ্রিল ২০২১ বাদ জোহর নায়িকা কবরীর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে কবরস্থান প্রাঙ্গণে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। অভিনেত্রী কবরীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া শোক জানিয়েছেন রাজনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 11, May 2021, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd